কাঁদতে আসিনি
ফাঁসির দাবী
নিয়ে এসেছি
মাহবুব উল আলম চৌধুরী

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ, বিএ অনার্স; এমএ
স্বত্বাধিকারী, পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
যোগাযোগ : ১৭৯/৩, ফকিরেরপুল
জিপিও বক্স নং ৪১৫, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৪৫৮১৬, মোবাইল : ০১৭২০৩০৮৮৬১

তৃতীয় প্রকাশ
১৫ ফাল্গুন ১৪১১
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

গ্রন্থস্বত্ব
জওশন আরা রহমান

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মুদ্রণ
মাটি আর মানুষ
১৭৯/৩, ফকিরেরপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য ঃ পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা

KANTE ASENEE FASHIR DABEE NEYA ASECHI : (a collection of poems) by Mahbub ul Alam Chowdhury. Published by Forkan Ahmad. Proprietor, Palok Publishers, 8/2, North South Road, Purana Palton, (Contact : 179/3, Fakirerpool) GPO Box No 415, Dhaka-1000, Bangladesh. Cover designed by quayum Chowdhury. 3rd Edition 27 February 2005, Price Tk. 75.00 US $ 5

ISBN 984 445 166 03

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত মামা
আহমদ কবির চৌধুরী
আহমদ সাগীর চৌধুরী
ও
লুৎফে আহমদ চৌধুরী'র
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে

ভূমিকা

মাহবুব উল আলম চৌধুরী (জন্ম ১৯২৭) এককালে চট্টগ্রাম থেকে 'সীমান্ত' নামে একটি মর্যাদাবান মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করতেন (১৯৪৭-১৯৫২)। চট্টগ্রামের ছাত্র-আন্দোলন, রাজনৈতিক উদ্যোগ ও সাংস্কৃতিক কর্মধারার সঙ্গে তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি কবিতা, ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটক লিখতেন, তার মধ্যে বেশ কিছু রচনা সমঝদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাঁর বিশেষ একটি কবিতা রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল, সরকারি আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল এবং মাহবুব উল আলম চৌধুরীর খ্যাতি বিস্তৃততর ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত হয়েছিল।

কবিতাটির নাম 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় গুলিবর্ষণ ও হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে লেখা এটিই ছিল প্রথম কবিতা। মাহবুব উল আলম চৌধুরী সে সময়ে চট্টগ্রাম জেলা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারির ঠিক আগে আগেই তিনি আকস্মিকভাবে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। ঢাকার ছাত্রহত্যার খবর পেয়ে একুশে রাতেই রোগশয্যায় শুয়ে এই দীর্ঘ কবিতাটি তিনি রচনা করেন। রাতেই সেটি মুদ্রিত হয় এবং পরদিন প্রচারিত ও চট্টগ্রামের প্রতিবাদ সভায় পঠিত হয়। এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস লিখেছেন:

জলবসন্তে আক্রান্ত সুশ্রী মাহবুব উল আলম চৌধুরীর সুদীপ্ত দু'টি চোখে ঝরছিল আগুন। তাঁর কলম দিয়ে বেরিয়ে আসে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো জ্বলন্ত এক দীর্ঘ কবিতা, 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। আন্দরকিল্লায় অবস্থিত একটি প্রেসে কবিতাটি পুস্তিকার আকারে প্রকাশের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। ব্যবস্থা হয় সারারাত প্রেসে কাজ চালিয়ে পরদিন সকাল বেলার মধ্যে গোপনে প্রকাশ করতে হবে অমর একুশের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি, প্রথম সাহিত্য সংকলন।

রাতের শেষ প্রহরে কম্পোজ ও প্রুফের কাজ যখন সমাপ্ত প্রায়, হঠাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশ হামলা করে উক্ত ছাপাখানায়। প্রেসের সংগ্রামী কর্মচারীদের উপস্থিত বুদ্ধি ও ক্ষিপ্রতার মধ্যে দ্রুত লুকিয়ে ফেলা হয় আমাকেসহ সম্পূর্ণ কম্পোজ ম্যাটার। তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজির পর পুলিশ যখন খালি হাতে ফিরে চলে যায় শ্রমিক-কর্মচারীরা পুনরায় শুরু করেন তাদের অসমাপ্ত কাজ। শ্রমিক শ্রেণী যে ভাষায় যে দেশে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার সংগ্রামী চেতনা যে অসাধারণ তার প্রমাণ সেদিন হাতে হাতে পেয়েছিলাম চট্টগ্রামে। দুপুরের মধ্যে মুদ্রিত ও বাঁধাই হয়ে প্রকাশিত হয় 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি'। .....

অপরাহ্নের লালদীঘির ময়দানের জনসমুদ্রে সভাপতির আসন অলংকৃত করলেন চট্টগ্রামের মুসলিম লীগ নেতা জনাব রফিউদ্দিন সিদ্দিকী। সভার কর্মসূচির এক পর্যায়ে ছিল মাহবুব উল আলম চৌধুরীর রচিত 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' পাঠ। কবিতার যেমন ভাষা, তেমনি তার ভাব, তেমনি ছন্দ। শ্রোতৃবৃন্দ একেকবার উত্তেজিত হয়ে ফেটে পড়ছেন আর আওয়াজ তুলছেন 'চল চল ঢাকা চল।

দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার সৌভাগ্য হয়না সকল সাহিত্যকর্মের। এই কবিতাটি তা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হলেও হাতে হাতে কবিতাটি পূর্ব বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গিয়েছিল।

পাদটীকাস্বরূপ একটি কথা বলা দরকার। এই কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারির চল্লিশজন শহীদের উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য হিসেবে এটি অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে, কিন্তু তখন আমাদের এমনই ধারণা হয়েছিল। হাসান হাফিজুর রহমানের সুবিখ্যাত 'অমর একুশে' কবিতায় পঞ্চাশজন শহীদের কথা বলা হয়েছে। তিনিও তো ভাষা-আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

একুশের প্রথম কবিতা যে মাহবুব উল আলম চৌধুরী লিখলেন, তা হয়তো আকস্মিক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে কবিতা তাঁকে লিখতেই হতো তাঁর সমগ্র জীবনাচরণ ও সাহিত্যচর্চার ধারায় তা ছিল অনিবার্য। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে তিনি মিলিয়েছিলেন একই স্রোতে।

সেই কিশোর বয়সে এবং তার পরেও যেসব কবিতা তিনি লিখেছিলেন, তাতে ধরা পড়েছে চল্লিশের দশকে যাকে প্রগতিশীল কবিতার ধারা বলা হতো, তার ছাপ। তাঁর ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সম্ভবত: প্রায় সমবয়সী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং কিছুটা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'প্রিয়তমাসু' ও 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' শিরোনামের কবিতা তো সুকান্তই লিখেছিলেন; 'একটি মোরগের কাহিনী' হয়তো 'কুকুরের কান্না'র প্রেরণাস্থল;

ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিতে সুকান্তের প্রেরণা আরো আছে। 'অঙ্গীকার' কবিতাটি বিশেষ করে তার প্রথম স্তবক মনে করিয়ে দেয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মে-দিনের কবিতা'কে। মাহবুব উল আলম চৌধুরী এঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন এবং এ বিশ্বাসকে কবিতায় সমর্পণ করার অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন, আর কারো কাছে নাহোক, নিজের কাছে।

মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতার বিষয় মুখ্যত: স্বদেশ, গৌণত: প্রেম। প্রেমের কবিতা কখনো কখনো স্বদেশের কবিতা হয়ে উঠে: স্বদেশ বিষয়ক কবিতা প্রায়ই সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের কথায় পরিণত হয়।

তিনি বলছেন:

কামনা করিনি কভু উষ্ণবক্ষ প্রেয়সীর গাঢ় আলিঙ্গন
কাঁঠালী চাপার গন্ধ মুক্তপক্ষ পাখিদের গান
চাঁদের রূপালি আলো সমুদ্রের স্নান
একখানি ছোটঘর ছবির মতোন
কমল কলির মতো আকাঙ্ক্ষার পদ্ম-উন্মীলন
আমি বুঝি চাই নাই প্রিয়ার চুলের ছায়া বুকের বিশ্রাম
প্রতিদিন ঘরে এসে কর্মশেষ মুহূর্তের দাম।

(প্রিয়তমাসু)

কিন্তু নিষ্ঠুর বাস্তব এই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকে সত্য বা চরিতার্থ হতে দেয়নি। তাই তাঁর প্রতিজ্ঞা শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করবেন। তাঁর বেদনাবোধ কখনো কখনো সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে, কখনো তা রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধে, কখনো বা চাপা বিদ্রূপে:

আমরা এদেশের নিরক্ষর মানুষ
রাজা আর রাষ্ট্রপতির তফাৎ বুঝি না,
আমরা আপনাদের রাজা বলেই জানি,
হলেনই-বা রাজা তবু স্বদেশীতো,
রাজা হিরোহিতোর সম্মানের জন্য
জাপানিরা এখনও হারিকিরি করে,
আপনাদের সম্মানের জন্য
আমরা কি উপোস থাকার মতো
ত্যাগও স্বীকার করতে পারবো না?

(জাপানীরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি করে)

কবিতা রচনা, জীবনগঠন আর বিপ্লবপ্রয়াস তাঁর কাছে হয়ে ওঠে একই বিষয়:

তাই আমার মনের এই ভালোলাগাটাকে
খুব সযত্নে পাহারা দিয়ে আমি চলছি
উদ্দাম জনযাত্রার মিছিলের সাথে সাথে
যেখানে আমি নির্দেশ পেয়েছি আরও একটি কবিতা রচনার।
যে কবিতা তোমার আমার সকলের একান্ত আপনার।

(ভালো লাগা)

এমনকি, এক পর্যায়ে তিনি ভাবছেন একুশের কবিতাও রচনা করবেন না:

সাম্যের স্বদেশ ভূমি গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে–
যারা আজ নেমে গেছে দুরন্ত সংগ্রামে
আসাদের রক্তমাখা ছেঁড়া শার্ট বুকে চেপে
চলে গেছে দুরান্তর গ্রামে
তাহাদের সাথে আমি হাঁটিতেছি পথ
যেখানে কাস্তের মুখে

কিষাণের তীব্রতর ঘৃণা,
দেখিতেছি সেইখানে
সালামের গুলিবিদ্ধ কলজেটা খুঁজে পাই কিনা।
(একুশ : ১৯৭০)

এই বই মাহবুব উল আলম চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। ১৯৪৬ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে তাঁর উনিশ থেকে সাতান্ন বছর বয়সের মধ্যে লেখা কবিতা এতে সংকলিত হয়েছে। এ সময়ে বিশ্বে ঘটেছে অভাবিত পরিবর্তন; দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটেছে, সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে; যুদ্ধপ্রয়াস চলেছে যেমন, তেমনি চলেছে শান্তির আন্দোলন। আমরা সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্ত হয়েও আরেক ধরনের ঔপনিবেশিক শাসনে পরিণত হয়েছি, তার থেকে মুক্তি লাভের জন্যে যুদ্ধ করেছি। তারপরেও শোষণ ও বঞ্চনার শেষ হয়নি, শেষ হয়নি ষড়যন্ত্রের। মাহবুব উল আলম চৌধুরীর কবিতায় প্রায় চল্লিশ বছরের এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর অনেক কবিতার বিষয় এক অর্থে সাময়িক; কিন্তু সময়ের বদলে যেহেতু আমাদের ভাগ্য পরিবর্তন হয় না, তাই সেই সাময়িক পেয়ে যায় চিরন্তনের আসন:

রাজারে রাজা এ কেমন সাজা
উঠতে গেলে বসতে বলিস
বসতে গেলে ছুটতে।
হরিণ হয়ে ছুটি যদি
বলিস তখন উড়তে।
হাতে পায়ে শিকল দিলি
কেমন করে উড়বো।
বুকে জ্বালা মুখে তালা
কেমনে মুখ খুলবো।
.....
ভাই মেরেছিস– বোন মেরেছিস
কেমন করে হাসবো
এবার যদি হাসতে বলিস
বজ্র হয়ে আসবো।
(ছড়া)

ভাগ্যিস ছড়ার শেষে রচনাকাল দেওয়া আছে ১৯৬০, নইলে কী ভুলই না বুঝতে পারতাম!

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' বইতে ধরা পড়েছে ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং একজন সংবেদনশীল মানুষের অন্তরঙ্গ অনুভূতি। আর তা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাতে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্বভাবটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়; তিনি কবি, তিনি সমাজপরিবর্তনপ্রয়াসী সৈনিক।

আনিসুজ্জামান
১ ফাল্গুন ১৩৯৪

লেখকের নিবেদন

আমরা যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সাহিত্য চর্চা করেছি তারা সাহিত্যকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার হতে হবে এ ধরনের দাবিও এক সময় তুলেছিলাম। এ দাবি যারা সাহিত্যের বিশুদ্ধতা ও নন্দনতাত্ত্বিক সম্পূর্ণতায় বিশ্বাসী তারা অগ্রাহ্য করেছিলেন বটে– তবে আমাদের বুকের তলায় সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে যে আগুন জ্বলছিল তার উত্তাপ কেউ অস্বীকার করতে পারেনি। এ উত্তাপ নিয়ে আমি চল্লিশ দশকে কলম হাতে নিয়েছিলাম। এই বইয়ে সংকলিত কবিতাগুলো তারই ফসল।

ভাষা আন্দোলনের শহীদদের সম্পর্কে আমার কবিতা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতেই রচিত হয়েছিল। দীর্ঘ কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি এবং প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়। এই আটকাদেশ দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকার ফলে কবিতাটি এক সময়ে চিরতরে হারিয়ে যায়। ১৯৮৩ সালে আমার স্মৃতি থেকে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম এর সামান্য অংশ উদ্ধার করলেও গোটা কবিতাটি অবলুপ্ত থেকে যায়। কিছুদিন আগে প্রীতিভাজন মফিদুল হকের সৌজন্যে আমি কবিতাটির মূল অংশটি পাই এবং এর সঙ্গে আমার অন্যান্য কবিতা যোগ করে একটি কবিতার বই প্রকাশ করার প্রেরণা অনুভব করি। মূল কবিতার অংশবিশেষ সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্য মফিদুল হকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এক সময় রাজনীতি করতাম– এই অজুহাতে এই দেশে যখনি রাজনৈতিক দুর্যোগ নেমে এসেছে তখনি আমার বাসস্থান বার বার পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। আর আমার বইপত্র, মূল্যবান রাজনৈতিক দলিল ও পান্ডুলিপিগুলো হয়েছে এই আক্রমণের শিকার। ১৯৭১ সালে চরম আক্রমণের মুখে আমি আমার সব লেখা ও অন্যান্য বইয়ের পান্ডুলিপি হারিয়ে বসি।

লেখাগুলো উদ্ধার কিংবা সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য মনে করে আমি কবিতার বই প্রকাশের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। কিন্তু আমার অনুজপ্রতিম কবি দীননাথ সেন (কলকাতা), মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মেজবাহ উদ্দীন জঙ্গী, আমার স্ত্রী জওশন আরা রহমান এবং আমার মেয়ে সাফিনা আহমেদ, জামাতা ইশতিয়াক আহমেদের অসাধারণ ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের ফলে কিছু সংখ্যক কবিতা বিভিন্ন সূত্র থেকে উদ্ধার এবং সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এদের শ্রম, অধ্যাবসায় এবং কবিতার বই বের না করলে সম্পর্কচ্ছেদের হুমকি বই প্রকাশনার প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁদের সবার জন্য রইলো আমার প্রাণঢালা ভালোবাসা।

এছাড়া সোদর প্রতিম সামাদ ভাই (জনাব আজিজুস সামাদ) এবং বন্ধু জাহেদ হোসেনের উপর্যুপরি তাগিদ অসহনীয় হয়ে না উঠলে এ বইয়ের পান্ডুলিপি অত সহজে প্রেসে যেতো না।

লেখক হিসেবে আমার পরিচিতি নতুন প্রজন্মের কাছে নেই বললেই চলে। ভূমিকা লিখে দিয়ে এ পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে পরম সুহৃদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। তাকে সস্নেহ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইয়ের প্রচ্ছদটি এঁকেছেন জনাব কাইয়ুম চৌধুরী। তাঁর প্রতি আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

মাহবুব উল আলম চৌধুরী
সীমান্ত
বাড়ি-৪৮, সড়ক-২০, সেক্টর-৩
উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

সূচিপত্র

নজরুলের উদ্দেশে.....৮
আমি এক দুরন্ত সৈনিক.....৯
ভালো লাগে.....১১
মালবিকা.....১২
সূর্যদিন.....১৩
মাটির গান.....১৪
স্বাধীনতা.....১৫
জাপানীরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি কওে.....১৬
তোমার চুল.....১৯
কল্পনার মুহূর্ত.....২০
হে পৃথিবী.....২১
উড়ে চলে গেছে পাখি.....২২
প্রিয়তমাসু.....২৩
কুকুরের কান্না.....২৫
রবীন্দ্রনাথের প্রতি.....২৬
পঁচিশে বৈশাখ.....২৭
জন্ম যন্ত্রণা.....৩০
অবাঞ্ছিত.....৩১
কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি.....৩২
হতাশার গান.....৩৭
নস্ট্যালজিয়া.....৩৮
বুদ্ধিজীবী.....৩৯
পালাই পালাই.....৪০
কুয়াশার বীজ.....৪১
পরিক্রমা.....৪২
জীবনের সফলতা.....৪৩
দিয়ে যাই বলি.....৪৪
একুশ : ১৯৭০.....৪৫
দুঃসময় : ১৯৭১.....৪৬
অঙ্গীকার.....৪৯
একুশ : ১৯৭২.....৫০
জারেজরা সব শোন.....৫১
একটি নদীর নাম.....৫২
স্বাধীনতা : ১৯৮৪.....৫৪
ভয় লাগানো গোঁফ.....৫৫
জসিমউদ্‌দীনের মৃত্যুতে.....৫৬
ওরা দুইজন.....৫৭
এ বি সি.....৫৮
ছড়া.....৫৯
ছড়া.....৬০

নজরুলের উদ্দেশে

হাজার বছর ধরে তপস্যায় রত
কোনো এক মৌন তাপসের মতো
নিরুক্ত নির্বাক তুমি নির্বোধ নির্মম
ঊর্ধ্বে নীলোজ্জ্বল ব্যোম প্রশান্তির মহাছত্রসম
পদতলে উদার মৃত্তিকা মাঝে কোলাহল কলরোল কত উৎসব
বোবা মুখ মুখর হলো কত
তুমি শুধু অভিমানী বালকের মতো এখনো নীরব।

কী ভীষণ পণ তুমি করিয়াছো ওগো মৌনব্রতী
কোন মহাবাণী শোনাবার তরে
মনে মনে চলিতেছে আগ্নেয় প্রস্তুতি
পিঙ্গল পালক পুটে দিকে দিকে আকাশ বিহারী শঙ্খ চিল
বহু দুঃখ বেদনায় জীবনের বৈচিত্র্য আজ হয়েছে শিথিল।

তবু এ পৃথিবীর নিঃসঙ্গতা যখনি করি অনুভব
ফুলের গন্ধের মতো তুমি আসো সারা মন ভরি
তুমি আসো এ জীবনে বিদ্রোহের ছায়াপথ ধরি
তুমি ছাড়া অর্থহীন মনে হয় জীবনের লক্ষ কলরব।

১৯৪৬

আমি এক দুরন্ত সৈনিক

নতুন সূর্যের সোনার অক্ষরে রঞ্জিত
একটি প্রহরের প্রতীক্ষায় আছি
প্রতীক্ষায় আছি– আকাঙ্ক্ষিত জীবনের
আনন্দময় মুহূর্তে হিরন্ময় কান্তির তরুণচ্ছটায়
একটি বাঞ্ছিত পুষ্প মালিকা প্রেয়সীর হাতে তুলে দেবার
একটি উদয়-উৎসবের প্রতীক্ষায় আছি।

প্রতীক্ষায় আছি নবারুণ রক্তিম মাধুর্যমণ্ডিত
নববিকাশের জ্যোতির্ময় অভ্যুত্থানে
বক্রজীবনের উত্তুঙ্গ শিখর আর
অন্ধকারাচ্ছন্ন আরণ্যক পথ অতিক্রম করে
নবজীবনের সুর মন্ত্রিত তরঙ্গ সঙ্গীতের
ইন্দ্রজাল দোলা একটি মধুর রাগিনী
একান্ত বিজনে প্রেমিকাকে শোনাবার জন্য
একটি পূর্ণতায় উচ্ছল মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আছি।
মধু যামিনীর মিলন লীলায়িত একটি মুহূর্তের।

রামধনু আঁকা জানালার কাছাকাছি–
আকাশের কোলে বাঁকা একফালি চাঁদ।
দূরে বহুদূরে দু'টি তারা
তুমি আর আমি একটি মধুর শব্দ
আর সব নিস্তব্ধ।

যেদিকেই চাই জীবন-জীবন– কেবলি জীবন,
দারিদ্র অপসারিত-বিপ্লবলব্ধ, সমুদ্র বিস্তার
একটি বিস্বাদবিহীন সীমাহীন সুন্দর অতি সুন্দর
মধুর সুন্দর জীবনের অপেক্ষায় আছি
প্রতীক্ষায় আছি।
প্রতীক্ষায় আছি তাই
একতারা হাতে নিয়ে বাউলের মতো পথে নেমেছি
বিদ্যুৎঝলকে বহ্নি দোলায় দেহমন দিয়েছি দুলিয়ে
সিন্ধু মিলনের কল্লোলিত গানে সংযোজন করেছি
শিখায়িত সঙ্গীতের সুর

শত্রু শৃঙ্খলিত বন্দিনী পৃথিবীর
তমিস্রা চূর্ণের দুরন্ত শপথ নিয়ে
হাতে নিয়েছি জীবন-সমর্পিত সংগ্রামের হাতিয়ার
কলা লক্ষ্মীর যন্ত্রে যন্ত্রে তাই তুলেছি
সংগ্রামের সুর মন্ত্রিত রাগিনীর ঝংকার।
তাই অতিক্রমনীয়তার উত্তপ্ত ধূসর শত্রু বিস্তারিত

কাল রাত্রির কণ্টকাচ্ছন্ন দুর্গম পথের অন্ধকার ঢেকে ঢেকে
এগিয়ে চলেছি চরণ চিহ্ন এঁকে এঁকে
সর্বশরীরে লালক্ষত আঁকা দুর্জয় নির্ভীক
পীড়িত মানবতার স্বপ্নে বিভোর
আমি এক দূরন্ত সৈনিক।

১৯৪৬

ভালো লাগে

ভালো লাগে আকাশটাকে মদালস চোখে
চেয়ে চেয়ে নিজের মধ্যে নিজেকে অনুভব করতে
ভালো লাগে তোমার ঘনকৃষ্ণ চুলের ছায়ায়,
রহস্যের তরঙ্গ মাঝে নিজেকে একটু দুলিয়ে নিতে

কিন্তু আমার জীবনে এর অবসর কোথায়
কোথায় জীবনে যৌবন উচ্ছ্বসিত আনন্দের ঢেউ
কোথায় সেই মন– আর মদালস চোখ
কোথায় কোথায় পাখি আর তার মুক্ত কলতান।

প্রিয়তমা, তুমি আমার কাছ থেকে চেয়েছিলে
জীবনের সমস্ত রোমাঞ্চ সমর্পিত একটি প্রেমের কবিতা
প্রিয়তমের কণ্ঠচ্যুত মালার মতো একটি কবিতা
অন্ধকার গতি-নগ্ন চাঁদের মতো যার রূপ।
তুমি আমার কাছ থেকে চেয়েছিলে তেমন একটি কবিতা।

কিন্তু জীবনে সযত্নে নীড়ের সন্ধান তো পেলাম না,
পেলব বাহুর পরশ, একটু চঞ্চলতা, আরামপ্রদ একটু উত্তাপ
কই কোথায়– এখনো তো পেলাম না।
তাই আমার মনের এই ভালো লাগাটাকে
খুব সযত্নে পাহারা দিয়ে আমি চলছি
উদ্দাম জনযাত্রার মিছিলের সাথে সাথে
যেখানে আমি নির্দেশ পেয়েছি আর একটি কবিতা রচনার।
যে কবিতা তোমার আমার সকলের একান্ত আপনার।

নতুন হাওয়ার তরঙ্গ হিল্লোলে
আমার কবিতা আজ দুলে দুলে উঠেছে
দু'কূলে ছাপিয়ে কূলে কূলে ফেটে পড়ছে আজ
আমার জীবনের সমস্ত যৌবন রস
আমার রূপ দিতে চলেছি জন-জীবনের
নতুন নীড় রচনার একটা দুরন্ত শপথকে।

প্রিয়তমাসু, রোমান্টিক কিনা জানি না,
এটাই হচ্ছে আমার জীবনের সার্থক রচনা,
যেখানে রহস্য নেই অথচ আছে পূর্ণতা
তাই নিজের কাছে নিজের কবিতাটি খুবই ভালো লাগছে
ভালো লাগছে এটাকেও একটা রোমাঞ্চ ভেবে নিতে।

১৯৪৬

মালবিকা

আমার জীবনে কেন কোনোদিন বসন্ত এলো না
আমার হৃদয় কেন চিরদিন এত কেঁদে
আরেকটি হৃদয় পেল না।

মালবিকা আমি জানি কতবড় তোমার হৃদয়
সেখানে দিলে না কেন এই শিশুটিকে
সামান্য আশ্রয়।

ঝড়ের আভাস পেলে ছোট্ট তরী
তীব্রবেগে ছুটে চলে তীরের সন্ধানে
হিংস্র পশুর তাড়া খেয়ে তেমনি আমিও
বার বার ছুটে গেছি তোমাদেরি পানে
তোমার সেই গগণজোড়া হৃদয়ের কোণে
একটুকু ঠাঁই কেন দিলে না কোনোখানে
অথচ শুনেছি আমি নারীর হৃদয়
দুঃসময়ে চিরকাল জননীর কোল হয়ে
অসহায় পুরুষকে দিয়েছে আশ্রয়
মালবিকা, এদেশের সকল জননী
শহরে বন্দরে
শত্রুর নির্মম গুলিতে তাহলে কি
মরে গেছে দুঃসহ মন্বন্তরে।

১৯৪৬

সূর্যদিন

এইখানে কারাগরে সূর্যদিন গুণি
নিষ্ঠুর আঘাতে যদি স্তব্ধ হয় রক্তের আবেগ
পরিচ্ছন্ন পৃথিবীর কোমল শয্যায়
বসন্ত হাওয়ার বুকে বনের মতোন
সবুজ পাতার কোলে সদ্য তোলা ফুলের মতোন
মানুষের মন।
নতুন পৃথিবী আর নতুন মানুষ নতুন মাটির গন্ধ,
জীবনের স্থির নিশ্চয়তা
অবিরত জ্ঞানের পিপাসা,
সৌরলোকে মানুষের মুগ্ধ পরিক্রমা
শিশুর আশ্চর্য চোখে প্রিয়ার মতোন
নতুন পৃথিবী যদি দেখে যেতে না পারি এখন
আসে যদি ধোঁয়াটে মরণ
যেতে হয় যদি সেই আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা লয়ে
চলে যাব মৃত্যুর শান্তির স্বাদ দু'চোখে মাখায়ে
শুধু রেখে যাবো নৈবেদ্যের থালে
প্রাণের পরশমাখা দু'ফোটা রক্তের চুমো।

জ্বলন্ত বিশ্বাস, রাক্ষসের শোষণবিহীন
নিশ্চিত আসিবে মোর প্রতীক্ষিত দিন
রাহুমুক্ত হবে ইতিহাস।

১৯৪৭

মাটির গান

মাঠভরা ক্ষেত সোনালী ধান মোদের প্রাণ
মাটির দান
কিষাণ কণ্ঠে রাখালিয়া সুরতান
মাটির দান
নীলাকাশ নীচে ধূ-ধূ করা মাঠ সোনায় রাঙা
ফসলে ও ফুলে ঢাকা তার ঢালু ডাঙ্গা
মাটির বুকেতে আপনার হাতে
ফসল তুলিল যারা
দেনা পাওনার ভাগা-ভাগিতে
তারা যে সর্বহারা

চোখ ভেসে যায় জলে,
কিষাণের সাথে জবরদস্তী মহাজনী ভাগ চলে।

প্রকৃতির উৎসব
ফুল আর ফল পাখিদের কলরব।
মিথ্যে সব মিথ্যে সব
দুঃখ চিন্তায় বোবা মুখগুলি ভুলে গেছে সব রব।
হায়
মাটির দান
তাদের দান
মাটির প্রাণ
তাদের প্রাণ।

১৯৪৭

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা চায় প্রাণ
স্বাধীনতা লাগি প্রতিজ্ঞা দুর্বোধ:
দুর্জয় অভিযান
জাল জুয়াচুরি শোষণের প্রতিরোধ।

স্বাধীনতা লাগি কত যে লক্ষ বীর
বুলেটের মুখে রক্তের বিনিময়
প্রাণ দেয়া নেয়া প্রতিজ্ঞা সুগভীর
জয়ের চিহ্ন না জানি সুনিশ্চয়।

স্বাধীনতা নয় শাসন মুক্ত হওয়া
স্বাধীনতা তুমি শোষণের অবসান
তাজা তাজা প্রাণ
খুশি চঞ্চল হাওয়া
কোটি কোটি মূক মানুষের জয়গান।

১৯৪৭

জাপানিরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি করে

আপনাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা অস্বীকার করি না,
আপনার মহৎ, আপনারা না হলে আমরা স্বাধীনতা পেতাম না।

আপনাদের অশেষ দানে আজ এদেশে ক্ষুধা বেআইনী,
দেশপ্রেম কারা প্রাচীরের অন্তরালে। আপনারা সম্মানী,
আপনারা না হলে অহিংস বেয়নেটের খোঁচায়
আমরা প্রাণ দেওয়ার অধিকার পেতাম না।

প্রজাতন্ত্র ও ইসলামী হুকুমতের বিধানে,
পুলিশের অপরিসীম ক্ষমতায়,
নারী মিছিলের উপর তার সৎ প্রয়োগের নমুনায়
আমরা বিস্মিত হওয়ার সুযোগ পেতাম না।

নারী জাতিকে আপনারা পথে বের করেছেন,
অবরোধবাসিনীকে দিয়েছেন বুকে গুলি নেওয়ার সাহস,
আপনাদের অশেষ দানে পরিতুষ্ট।

আপনারা না হলে মার্কিনী ডলারের উচ্চমূলে,
আমরা দেশকে বিক্রি করতে পারতাম না,
মাসে দেড় লক্ষ টাকা খরচ না করলে,
অন্যান্য দেশের সামনে আপনাদের মান থাকে না,
আমরা আপনাদের সাথে বেঈমানী করিনি,
আমাদের রক্তের দামে
আমরা আপনাদের মাসে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ের
ক্ষমতা দিয়েছি।

আপনাদের আত্মত্যাগের কথা আমরা অস্বীকার করিনি,
তাই সভা সমিতিতে আপনারা উপদেশ খয়রাত করতে ডাকেন,

আমরা তখন ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দৌড় দিই,
আপনাদের খয়রাতে ভর্তি করে আনি আমাদের শূন্য ঝুলি,
বাঁচতে চাওয়াকে যখন আপনারা বেআইনী ঘোষণা করেছেন,
আমরা বাঁচতে চাই না,

আপনারা যদি মাঝে মাঝে ভৌতিক খাদ্য খাইয়ে,
আমাদের বাঁচান তাহলে আমরা বাঁচতে পারি।
বাঁচতে চাওয়ার নিদারুণ অপরাধে
আমরা প্রাণ দিতে চাই না,
তাই আপনাদের বাঁচিয়ে রাখার
পরম আনন্দ নিয়ে আমরা প্রাণ দিই,

বিশ্বাস করুন, আমরা বেঈমানী করি না,
আপনাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য
প্রাণ দিতে পারলে আমরা কৃতার্থ হই।

পৃথিবীতে চিরদিন গরিব আমীর ছিল, আছে, থাকবে,
এই রীতি চিরন্তন শাশ্বত,
সেই রীতি উল্টাতে আমরা চাই না,
আমরা চিরদিন গরিব হয়ে থাকতে চাই,
কারণ আমাদের গরিব হয়ে থাকার মধ্যেইতো
আপনাদের আমীর হয়ে থাকাটা নির্ভর করে,
আমরা আপনাদের সাথে
বেঈমানী করবো না,
কারণ আপনারা না হলে
আমরা স্ব-অধীনতাই পেতাম না।

আমরা এদেশের নিরক্ষর মানুষ
রাজা আর রাষ্ট্রপতির তফাৎ বুঝি না,
আমরা আপনাদের রাজা বলেই জানি,
হলেনই-বা রাজা তবু স্বদেশীতো,
রাজা হিরোহিতোর সম্মানের জন্য
জাপানিরা এখনও হারিকিরি করে,
আপনাদের সম্মানের জন্য
আমরা কি উপোস থাকার মতো
ত্যাগও স্বীকার করতে পারবো না?

আপনারা দেশকে ভাগ করেছেন
কারণ তা না হলে রামরাজ্য ও ইসলামী হুকুমতের
ক্ষেত্র তৈরি হয় না,
বিড়লা ইস্পাহানীতে বিরোধ বাঁধে,
আমরা বিরোধ চাইনি, শান্তি চাই,
আমাদের এই শান্তি চাওয়াটাকে
আপনারা দেশ ভাগ করে রূপ দিয়েছেন,
তার জন্য আপনাদের কাছে আমরা চিরঋণী।

তবু একদেশের সোনার বিলের স্বপ্নে
যখন আর দেশের আমার বুক উতলা হয়ে উঠে
তখন আমরা আপনাদের অসীম দয়ার কথা ভুলে যাই
এবং তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করি
যেমন করে জাপানিরা হিরোহিতোর জন্য
হারিকিরি করে।

আমরা অশিক্ষিত মানুষ, অশিক্ষিতই থাকতে চাই
কারণ আমরা শিক্ষিত হলেই আপনাদের বিপদ,

তাই আপনারা শিক্ষার ব্যয় কমিয়ে
আপনাদের ছেলেপুলেদের রাজপুত্রের মতো
শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, ক্যাডেট কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছেন,
প্রাইমারি স্কুল তুলে নিয়ে
লক্ষ লক্ষ গরিব শিক্ষকের ভাত কেড়ে নিয়েছেন,
তার জন্য আমরা আপনাদের কাছে অভিযোগ করবো না,
কারণ আরবী অক্ষরে বাংলা ভাষা প্রণয়ন করে
আপনারা আমাদের ভবিষ্যতে শিক্ষিত করে
গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছেন।
আপনাদের আশ্বাস মতে
আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ছাঁটাই! বেকার!
এসবের জন্য হয়তো বোকারা আপনাদের বিব্রত করে তোলে,
কিন্তু এসব নাহলে জাতীয় মূলধন
বাড়বে কি করে?

জাতীয় মূলধান না বাড়লে
আরবী অক্ষরের এক্সপেরিমেন্ট,
আপনাদের দেশ ভ্রমণের টাকা,
বিবি মেয়েদের গয়না,
রাজোচিত বাড়ি,
আধুনিক মডেলের গাড়ি
আপনাদের দেহরক্ষী
পুলিশ বাহিনীর বেতন
আসবে কোত্থেকে?

বোকারা বিব্রত করে বলেইতো আপনারা ক্ষেপেন,
ট্যাক্স বাড়ান,
কারণ বোকাদের শায়েস্তা করবার জন্য
পুলিশের সংখ্যাও বাড়াতে হয়।
আপনারা বোকাদের ক্ষমা করুন,
আর জাপানীদের ইতিহাস পড়তে শেখান,
কারণ তারা জানে না
জাপানীরা হিরোহিতোর জন্য হারিকিরি করে।
১৯৪৮

তোমার চুল

একদিন তোমার ক্লান্ত দেহের ভার
রেখেছিলে শরীরে আমার
সেদিন তোমার অবিন্যস্ত কিছু এলোমেলো চুল
আমার হৃদয়ের কাছে চেয়েছিল
একগুচ্ছ আরক্তিম ফুল।

তুমি তা জানো না। কেউ তা জানে না।
নারীর অবাধ্য চুল কোনোদিন শাসন মানে না।
চুল তার চিরকাল অবাধ্য স্বাধীন
হাওয়ার প্রশ্রয় পেলে উড়ে যায় মেঘের মতোন
বিচার করে না কিছু মাঘ কি আশ্বিন।
১৯৪৮

কল্পনার মুহূর্ত

আমার কল্পনার নির্জন মুহূর্তকে
সংকল্পের রেশম দিয়ে বেঁধে
আকাশের নীল টুকরোয়
রাত্রির হৃদয় থেকে উৎসারিত
তারার ঝর্ণার মতো
বুকের প্রান্তরে রেখে
ছুটে এসেছিলাম আমি তোমার কাছে
নিঃসঙ্গতার বেদনা নিয়ে।

পথে অভিশপ্ত মানুষের ক্ষুধার উন্মত্ততায়
কচি কিশলয়ের উপর শিশির বিন্দুর মতো
টলমল করছিলো আমার প্রতিটি মুহূর্ত
লাফিয়ে উঠতে চেয়েছিল কেউটে ফণার মতো,
এলাম তোমার কাছে।

তোমার অন্ধকার চুলের রহস্যে
তোমার বুকের আদিম আকর্ষণে
আমার সমস্ত রক্ত গান করে উঠলো
যেন সারা বিশ্বের পুরুষ পাখির ক্ষিপ্ত ঐকতান।
তারপর যতমান মুহূর্তকে খুঁজতে গিয়ে দেখি
পথের অনেক শব্দের ভিড়ে
হারিয়ে গেছে সে আরেকটি
জীবন দর্শনের আকর্ষণে।

১৯৪৮

হে পৃথিবী

হে পৃথিবী, কুমারী রাত্রির কোলে
কতকাল আর
রেখে যাবে রক্তপায়ী জারজের পদচিহ্ন
গাঢ় অন্ধকার!

মাঘের প্রাচুর্য ভরা গ্রামের ছায়ায়
কবে হবে আলোকের পদ্ম উন্মীলন
বনছায়া ঘননীল স্তব্ধ কিষাণ বধূর
কবে হবে মধুর মধুর!!

হে পৃথিবী, ঘুম নেই ঘুম নেই
দু'চোখে আমার
সময় সময় নেই বিবর্ণ আকাশ ভরা
তারা গুণিবার
আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে
মালয়ের রবারের বন
ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে
কোরিয়ার মায়েদের মন
দু'চোখে আমার আজ
শত্রু বিধ্বস্ত করার দুরন্ত স্বপন।
মধ্যরাত্রে কান্না শুনি আজো আমি
ক্ষুধার্ত শিশুর
অসংখ্য ক্রুশবিদ্ধ নতুন যীশুর
অজস্র রক্তের ধারা কঠিন শপথ হয়ে
আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে যায়
হে পৃথিবী, শক্তি দাও আমায় আমায়!!

হে পৃথিবী, তোমার কুমারী গর্ভে
খনির আগুন
আকাশের আমন্ত্রণে
পাহাড়ি বন্যার মতো নতুন জীবন
রক্ত মেঘে জন্ম দেবে কখন কখন!!

হে পৃথিবী, তুমি হবে কখন আকাশ
তোমার নরম বুকে তারার মতোন
কবে হবে ফসলের চাষ
কবে হবে তুমি বন্ধু
মানুষের বাসযোগ্য নতুন আবাস!
হে পৃথিবী, আমি হবো অধীর বাতাস
ঝড়ের গতির বেগে তুমি হও দুরন্ত আকাশ!!

১৯৪৮

উড়ে চলে গেছে পাখি

উড়ে চলে গেছে পাখী
রেখে গেছে হাওয়ার সমুদ্রে ঢেউ
পাতা নড়ে, ঘাস কাঁপে
শিশুর দোলনার মতো
দুলে উঠে আমাদের নরম হৃদয়ো ॥

সময়ের মাঠে মাঠে
পঙ্গ পালের মতো ঘুরিতেছে
আমাদের ক্ষুধাতুর বোধ
ফসল ফুরায়ে গেছে
পড়ে আছে শুকনো খড়, মরা গরু
সাপের খোলস
শূন্য মাঠে চরিতেছে চোখ ॥

কখনও কোথাও যদি দেখি
দুর্লভ সোনার মতো
পড়ে আছে বিপন্ন বিবরে
কোনো এক বাঞ্ছিত রতন
তখন
নির্বাণ বুদ্ধির স্বপ্নে
ডানা মেলে অকস্মাৎ
উড়ে চলে মন
আরেক নীল নক্ষত্রের ভিড়ে ॥

১৯৪৯

প্রিয়তমাসু

হয়তো ভেবেছো তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এক রূঢ় পদাতিক
ভুলে গেছি জীবনের হৃদয়ের দিক
রক্তাক্ত ঘটনা দেখে মরে গেছে মন
কামনা করিনি কভু উষ্ণবক্ষ প্রেয়সীর গাঢ় আলিঙ্গন
কাঁঠালী চাপার গন্ধ মুক্তপক্ষ পাখিদের গান
চাঁদের রূপালি আলো সমুদ্রের স্নান
একখানি ছোটঘর ছবির মতোন
কমল কলির মতো আকাঙ্ক্ষার পদ্ম উন্মীলন
আমি বুঝি চাই নাই প্রিয়ার চুলের ছায়া বুকের বিশ্রাম
প্রতিদিন ঘরে এসে কর্মশেষ মুহূর্তের দাম।

অনিন্দ্য সুন্দর নারী কামনা কি করিনি কখনো
শিশুর হাসির আলো নয়ন জুড়ানো
ঘরের মাঠের শোভা সূর্যময় শান্তিময় সমধুর জীবন
কমল কলির মতো আকাঙ্ক্ষার পদ্ম উন্মীলন।
সব চাই তবু আজ প্রত্যাশিত কোথায় অবসর
নীড়মুখো পাখিদের ভেঙে গেছে ঘর।
ঝড়ের তাণ্ডবে আজ জীবনের শান্তি পলাতক
প্রতিদিন ঝড়ে পড়ে কল্পনার পাখির পালক
পৃথিবীর সব রং চুষে লয় পিশাচের রক্তলোভী ঠোঁট
পৃথিবীর সব হাসি কেড়ে নিতে নরঘাতী বাঁধিতেছে জোট।

উত্তীর্ণ হয়নি যে কিশোরের মাঠে মাঠে খেলার বয়স
তাকে দেখি আজ আমি ক্ষুধায় অবশ
বিষণ্ন জড়িত পদে ম্লানমুখে ক্ষুব্ধনত শিরে
দ্বারে দ্বারে হাড়ভাঙ্গা কাজ খুঁজে ফিরে
ব্যর্থ হয়ে অবশেষে ঘরে এসে ফেলি দীর্ঘশ্বাস
জঠরের যন্ত্রণায় গলে নেয় ফাঁস।
দেখেছি, দেখেছি বন্ধু ঈগলের প্রসারিত ডানার ছায়ায়
কতশত অপমৃত্যু প্রতিদিন পথে ঘাটে আগুন ছড়ায়
কতশত প্রিয়তমা বুকে নিয়ে নীড়মুখো পাখির আবেগ
শিকারীর আক্রমণে আকাশের নীলবুকে দিয়ে যায় মেঘ
কত লক্ষ মানুষের বিশীর্ণ বুকের রক্তে সভ্যতার এত অবদান
গজদন্ত মিনারের যৌনক্লিষ্ট উল্লসিত যৌবনের গান
কত রক্তে রাঙা ওই বাদশাহী প্রেমিকের তাজের মহিমা
স্তরে স্তরে বর্ণমিল বঞ্চনার পেয়ে গেছি সীমা
তাই আজ সীমাহীন আকাশের সূর্যকে তাকাই
প্রেম ও প্রিয়ার নামে মুষ্ঠিবদ্ধ প্রতিজ্ঞা জানাই
(মনের মতোন প্রিয়া যদি চেয়ে থাকি জীবনে কখনো)
যতদিন পঞ্চবনের রাবণের কামরোষে বন্দী থাকে জানকী আমার

নাহি পাই যতদিন জীবনের পরিপূর্ণ দাম
ততদিন রাক্ষসের স্বর্ণ লঙ্কা কনক পাহাড়
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যাব নেব না বিশ্রাম।

১৯৪৯

কুকুরের কান্না

চৈত্রের ডালের ছায়ায়
শুকনো পাতা পড়ে আছে
শ্মশানের কঙ্কালের হাড়ের মতোন
বিক্ষিপ্ত চারিদিকে।

রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে
কৃশতনু ক্ষুধিত কুকুর
একমনে জলাশয় খোঁজে
আর ব্যর্থ আক্রোশে
পা দিয়ে মাটি আঁচড়ায়
মাঝে মাঝে হাই তোলে
বিকট ডাক ছাড়ে
যেন দিগন্তের কান্না।

আমার হৃদয় যেন
লোম খসে যাওয়া
সেই তৃষ্ণার্ত কুকুর
যেখানে অসংখ্য বিষাক্ত কীট
আমার রক্তে প্রতিদিন হানা দিয়ে যায়,
আর এক হিংস্র যন্ত্রণায়–
আমি হাহাকার করে উঠি।

১৯৪৯

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

আমাদের জীবনের সংকটে সংগ্রামে
তুমি এক প্রেরণার বিশাল প্রদীপ
কখনো বিবিক্ত তুমি অনুপম অনুপ্রাসে
কখনোবা ধ্বংসমুখী জলোচ্ছ্বাসে আশ্রয়ের দ্বীপ।

কখনো পূষণ তুমি সূর্যের অধিক
হৃদয়ের আবর্জনা দগ্ধ করো বিদগ্ধ কিরণে
আলো দাও, বায়ু দাও, বৃক্ষ হয়ে ছায়া দাও,
বন্ধু হয়ে সঙ্গ দাও নিঃসঙ্গ জীবনে।

মরকত মণি তুমি আমাদের রামধনু ঐতিহ্যের পর্বত শিখরে
বিনীত বিস্ময় তুমি কখনো বা ছড়িয়েছো বৈশাখের
উদাস প্রান্তরে।
বর্ষণের স্নিগ্ধ সুরভিত তোমারই প্রাণহরা বিচিত্র সঙ্গীতে
নতুন দৃষ্টিতে আমি প্রথম দেখেছি এই স্বদেশের
সোনার প্রতিমা
কীর্তিনাশা-ধলেশ্বরী-পদ্মা-মেঘনা-বিশাখার ঢেউতোলা
প্রাণের সুষমা।
তোমারই কীর্তির ভাণ্ডার হতে তুলে নিয়ে
বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের কণা
জীবনের প্রথম আমি তিলোত্তমা মানসীকে করেছি রচনা।
তুমি তাই মিশে আছো জীবনের যন্ত্রনাকে ঘিরে–
হৃদয়ের মর্মমূলে, আমাদের চেতনার প্রচণ্ড গভীরে।

১৯৫০

পঁচিশে বৈশাখ

গত বছর ঠিক এমনি দিনে
এইখানে আমরা পঁচিশে বৈশাখের
আয়োজন করেছিলাম।
বিদেশী শয়তানের অপকৌশলে
আমাদের দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে
আমরা ভাগ করিনি আমাদের কবি-কে
বাঙালি ভাগ করেনি– বাঙালির মিলিত সংস্কৃতিকে।

গত বছর ঠিক এমনি দিনে
এইখানে আমরা আয়োজন করেছিলাম
পঁচিশে বৈশাখের।

মীনু গান গেয়েছিল, হাসিনা আবৃত্তি করেছিল
স্মৃতি আর হাসানের গীতিনৃত্যে মুখর হয়ে উঠেছিল,
আমাদের সেদিনের মিলনায়তনের শুভদিনটি
মুখর হয়ে উঠেছিল– আমার মনের, বাঙালি কবি।
সুধু বাঁশি বাজিয়েছিল– আমি পড়েছিলাম কবিতা,
কাকাবাবু বক্তৃতা দিয়েছিলেন– দিদিমা না বুঝেও হেসে উঠেছিলেন।

গত বছর ঠিক এমনি দিনে
এইখানে আনন্দের কী অবারিত ধূম,
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
গানের সুরে সুরে বলাকার ছন্দে ছন্দে,
ধূপ ধূন আর চামেলী-বেলীর গন্ধে গন্ধে
ছেলে-মেয়ে-তরুণ বুড়ো-বুড়ির
অন্তর নৃত্য চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।
আহা কী আনন্দ! আহা কী আনন্দ!!
গত বছর ঠিক এমনি দিনে
এইখানে আমরা পঁচিশে বৈশাখের
আয়োজন করেছিলাম।
বিদেশী শয়তানের অপকৌশলে
হিন্দু-মুসলমানের যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল
আমার ও তোমার মনে, বাঙালির মনে।
সেই প্রশ্নের সমাধি রচনা করেছিলাম–
রৌদ্র করদীপ্ত পঁচিশে বৈশাখের ভেতর দিয়ে,
বাঙলার আশা-বাঙালির ভাষা এক হউক বলে।

তাই সেদিন হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ওঠেনি
রাম রহিমের প্রশ্ন ওঠেনি, সেদিন আমরা বাঙালি,
বাংলার কবিকে বিশ্বের কবিকে বাঙালি হিসেবে

আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম,
ঠিক এমনি দিনে
এইখানে আমরা পঁচিশে বৈশাখের
আয়োজন করেছিলাম।

ভাঙা বাংলার ক্ষুব্ধ বাঙালি আবার
শক্তি সঞ্চয় করেছিল ধীরে ধীরে,
ভাঙা বাংলার ক্ষুব্ধ বাঙালি আবার
মিলিত হচ্ছিল– রাম রহিমের প্রশ্ন ভুলে
ভাঙা বাংলার ক্ষুব্ধ বাঙালি আবার
জেগে উঠেছিল– মসজিদ-মন্দিরের প্রভেদ ভুলে
ভাঙা বাংলার ক্ষুব্ধ বাঙালি আবার
আনন্দ মুখর হয়ে উঠছিল–
হোলী আর মহরমের যুক্ত মিছিলে
রাখী বন্ধনের নতুন আয়োজনের ভেতর দিয়ে।

বিদেশী শয়তান বাঙালির ঐক্যে
আবার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, আদেশ দিল
প্রভুভক্ত দালালদের কাছে–
কড়া আদেশ, কৃষ মজুরের অভিযানে
প্রতিরোধ চালাও! বাঙলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতির
নতুন সৃষ্টি সম্ভাবনার উপর আঘাত হানো,
বহু আঘাত আসলো, সেই আঘাতে
আর ভাঙে না বাঙালি। আবার সেই অস্ত্র
হানলো বিদেশী শয়তানেরা–
রাম রহিমের প্রশ্ন চাঙ্গা হয়ে উঠল
সেই প্রশ্নের প্রতিরোধকারী দেশপ্রেমিকরা,
দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেলো
কারা প্রাচীরের অন্তরালে।
হাসিনা জেলে গেছে
মীনু আর হাসান
দুর্বৃত্তদের হাতে প্রাণ দিয়েছে
কাকাবাবুর সাথে সুধু দেশ ছেড়েছে
রামের ঘরে যে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা
তার আগুনে আমার ঘরও জ্বলে গেছে
সুধুর বাঁশি আর আমার কলমও ছাই হয়ে গেছে
মীনু নেই, হাসিনা, কাকাবাবু নেই,
যারা ছিল পঁচিশে বৈশাখের আলোকস্তম্ভ,
তারা আজ কেউ নেই। অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে
আমরা ছিটকে পড়েছি নানা জায়গায়।

আবার পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এলো
ডাকছি, জোর গলায়: তোরা কই,

বুকের হাত-হুতাশ নিয়ে-আপনজনদের খুঁজছি:
ভাই-বোন তোরা কই।

কান্নায় বুক ভেঙ্গে এলো, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছি:
যে যেখানে আছিস ফিরে আয়।
যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে আমার জীবনে
তাতে রক্তের রেখায় লিখে যাচ্ছি, তোরা আয়!
আবার পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এলো, তোরা আয়!
এইখানে আবার আমরা
পঁচিশে বৈশাখের আয়োজন করবো,
আবার গান গাইবো, জীর্ণ যা কিছু যা কিছু মলিন
পুরানোর সাথে হউক তা বিলীন, আবার বাঁশি বাজাবো,
মঞ্চ সাজাবো, উৎসব-মুখর করে গড়ে তুলব নতুন বাংলাকে।

তোরা আয়, তোরা আয়।
পঁচিশে বৈশাখ আবার ফিরে এলো।
যে যেখানে আছিস মিছিল করে তোরা আয়।

গত বছরের মতো
এইখানে আমরা আবার
পঁচিশে বৈশাখের আয়োজন করবোই
মঞ্চ সাজাবোই, বাঁশি বাজাবোই:
শয়তান উপশয়তানের অপকৌশল ছিন্ন করে,
আমরা আমাদের কবিকে
আমাদের মিলিত সংস্কৃতিকে স্মরণ করবোই ॥

আবার পঁচিশে বৈশাখ ফিরে এলো,
স্মরণ করতেই বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠলো
সাথে সাথে মনে পড়লো:
গত বছর এমনি দিনে
এইখানে আমরা পঁচিশে বৈশাখের
আয়োজন করেছিলাম।

১৯৫০

জন্ম যন্ত্রণা

কী হবে এক ভীষণ জন্ম-যন্ত্রণার তীব্র অনুভবে
চেতনার আগুনে দগ্ধ হয়ে
ছন্দ গেঁথে কথা বুনে শব্দ ছেনে
এক উন্মাদ অস্থিরতায়
ইস্পাত-দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার ছেনি দিয়ে মগজের জটিল তন্তু
আঘাতে আঘাতে কেটে কুটে
কারুকার্যের আশ্চর্য কৌশলে
অশরীরি আত্মার ইচ্ছার নির্যাসে
কবিতার শরীর তৈরি করে।

কী হবে মালবিকার কথা বলে
যার অনাঘ্রাত শরীরের ভাঁজে গান
চোখে চোখে কথা, রূপে রঙে মাটির প্রতিমা
যার অখ্যাত হৃদয়ের কাছে নিমগ্ন হতে গিয়ে
একদা আমার হৃদয় বিখ্যাত হতে চেয়েছিল
ঈশ্বরকে গান শোনাবার প্রার্থনায়,
আমি একতারা হাতে নিয়েছিলাম
হে ঈশ্বর, তোমাকে গান শোনাবো বলে।

১৯৫১

অবাঞ্ছিত

মানুষের লোকালয়ে অবাঞ্ছিত
আমি এক বিপন্ন নাবিক
পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে পণ্য কাঁধে
নিরলস পথ হাঁটি। জনারণ্যে ঠাঁই নাই
স্বদেশে টিয়া পাখি হয়ে বাস করার
আজন্ম বাসনা আমার বিধ্বস্ত এখন
পেছনে ভয়াল মৃত্যু আততায়ী
সভ্যতার লোমশ জারজ ভগ্নী ব্যভিচারী
আমাকে অনুসরণ করে
প্রত্যহ আমি পলাতক গ্রাম থেকে গ্রামে শহরে বন্দরে,
এখন অরণ্যে আশ্রয় প্রার্থী দয়ালু ব্যাঘ্রের কাছে
সমর্পিত প্রাণ,
আমাকে পাহারা দেয়
অরণ্যের অধিবাসী বিশ্বস্ত পরিজন।

আমি যেন টিয়া পাখি এইসব প্রাণীদের কাছে
আমার বুকের শিশু এইখানে নিরাপদে খেলা করে,
হরিণ শিশুর সাথে
পল্লবিত জ্যোৎস্নার রাতে।
এখানে আমার শিশু বাঘিনীর স্তন্য পেয়ে
বেড়ে উঠে আকাশ বিদীর্ণ করা শালের মতোন

আমাকে বলো না আর
ফিরে যেতে তোমাদের কাছে....।

আমি থেকে যাবো এইখানে টিয়া পাখি হয়ে।
যাবো না যাবো না ফিরে তোমাদের কাছে
সভ্যতার নগরে বন্দরে।

১৯৫১

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

অমর একুশে স্মরণে প্রথম কবিতাটি রচিত হয়েছিল চট্টগ্রামে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখেই।

চট্টগ্রামে গঠিত সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক মাহবুব উল আলম চৌধুরী জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে তখন চিকিৎসাধীন। ঢাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনা শোনার পর রোগশয্যায় বসে তিনি ওই দিন এই কবিতা লেখেন। সে রাতে গোপনে একটি প্রেসে কবিতাটি ছাপা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় কবিতাটি প্রচারপত্রের মতো বিলি করা হয়। এই কবিতাটি একুশের প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি।

প্রকাশের কয়েকদিন পরেই মুসলিম লীগ সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।

–প্রকাশক

১৯৫২ সালে দশম শ্রেণীর ছাত্রী মনজুরা বেগম ভাগ্যক্রমে এই কবিতার অংশ বিশেষ পেয়ে যান। বড় ভাই পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন এবং সলিমুল্লাহ হলে পুলিশী হামলার কালে ছাত্রদের যে সব কাগজপত্র আটক করা হয় সেখানে এই কবিতাটিও ছিল।

ভাষা আন্দোলন প্রায় সকল বাঙালি পরিবারকেই কোনো না কোনোভাবে স্পর্শ এবং উদ্দীপ্ত করেছিল। পুলিশের কর্মকর্তা ভাই সস্নেহে আবেগ উদ্দীপ্ত ছোটবোনের হাতে আটক করা কবিতাটি তুলে দিয়েছিলেন এবং কবিতা পাঠে অভিভূত কিশোরী তার ডায়েরিতে তখন এটা টুকে রেখেছিলেন।

পরবর্তী জীবনে নানা ঘাত প্রতিঘাদের মধ্যদিয়ে কখনোই এই ডায়েরিটি সঙ্গ ছাড়া করেননি তিনি। অতি সম্প্রতি টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এই কবি এবং তার কাব্যকৃতি বিষয়ক আলোচনা দেখে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এটি লেখকের হাতে তুলে দেন।

স্কুল শিক্ষয়িত্রী মনজুরা বেগম সোনালী বোর্ড ও পেপার মিলসের নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব গোলাম মাওলা খানের স্ত্রী এবং দুই কন্যা ও এক পুত্রের জননী।

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে
রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার তলায়
যেখানে আগুনের ফুলকির মতো
এখানে ওখানে জ্বলছে অসংখ্য রক্তের ছাপ
সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি।
আজ আমি শোকে বিহ্বল নই
আজ আমি ক্রোধে উন্মত্ত নই
আজ আমি প্রতিজ্ঞায় অবিচল।
যে শিশু আর কোনোদিন তার
পিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার
সুযোগ পাবে না।
যে গৃহবধূ আর কোনোদিন তার
স্বামীর প্রতীক্ষায় আঁচলে প্রদীপ
ঢেকে দুয়ারে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না
যে জননী খোকা এসেছে বলে
উদ্দাম আনন্দে সন্তানকে আর
বুকে জড়িয়ে ধরতে পারবে না
যে তরুণ মাটির কোলে লুটিয়ে

পড়ার আগে বার বার একটি
প্রিয়তমা ছবি চোখে আনতে
চেষ্টা করেছিল
সে অসংখ্য ভাইবোনদের নামে
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত
যে ভাষায় আমি মাকে সম্বোধনে অভ্যস্ত
সেই ভাষা ও স্বদেশের নামে
এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে
আমি তাদের ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি
যারা আমার অসংখ্য ভাইবোনকে
নির্বিচারে হত্যা করেছে।

*[*কবির স্মৃতি থেকে যতটা জানা গেছে]*

কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি

ওরা চল্লিশজন কিংবা আরো বেশি
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে– রমনার রৌদ্রদগ্ধ কৃষ্ণচূড়ার গাছের তলায়
ভাষার জন্য, মাতৃভাষার জন্য– বাংলার জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
একটি দেশের মহান সংস্কৃতির মর্যাদার জন্য
আলাওলের ঐতিহ্য
কায়কোবাদ, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের
সাহিত্য ও কবিতার জন্য–
যারা প্রাণ দিয়েছে ওখানে
পলাশপুরের মকবুল আহমদের
পুঁথির জন্য–
রমেশশীলের গাথার জন্য,
জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটের' জন্য।
যারা প্রাণ দিয়েছে
ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন, গজল
নজরুলের "খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি
আমার দেশের মাটি।"
এ দুটি লাইনের জন্য
দেশের মাটির জন্য,
রমনার মাঠের সেই মাটিতে
কৃষ্ণচূড়ার অসংখ্য ঝরা পাপড়ির মতো
চল্লিশটি তাজা প্রাণ আর
অঙ্কুরিত বীজের খোসার মধ্যে
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের অসংখ্য বুকের রক্ত।
রামেশ্বর, আবদুস সালামের কচি বুকের রক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সেরা কোনো ছেলের বুকের রক্ত।
আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের প্রতিটি রক্তকণা
রমনার সবুজ ঘাসের উপর
আগুনের মতো জ্বলছে, জ্বলছে আর জ্বলছে।
এক একটি হীরের টুকরোর মতো
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে চল্লিশটি রত্ন
বেঁচে থাকলে যারা হতো
পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ
যাদের মধ্যে লিংকন, রকফেলার,
আরাগঁ, আইনস্টাইন আশ্রয় পেয়েছিল
যাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল
শতাব্দীর সভ্যতার
সবচেয়ে প্রগতিশীল কয়েকটি মতবাদ,
সেই চল্লিশটি রত্ন যেখানে প্রাণ দিয়েছে
আমরা সেখানে কাঁদতে আসিনি।
যারা গুলি ভরতি রাইফেল নিয়ে এসেছিল ওখানে
যারা এসেছিল নির্দয়ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে
আমরা তাদের কাছে
ভাষার জন্য আবেদন জানাতেও আসিনি আজ।
আমরা এসেছি খুনি জালিমের ফাঁসির দাবি নিয়ে।

আমরা জানি ওদের হত্যা করা হয়েছে
নির্দয়ভাবে ওদের গুলি করা হয়েছে
ওদের কারো নাম তোমারই মতো ওসমান
কারো বাবা তোমারই বাবার মতো
হয়তো কেরানি, কিংবা পূর্ব বাংলার
নিভৃত কোনো গাঁয়ে কারো বাবা
মাটির বুক থেকে সোনা ফলায়
হয়তো কারো বাবা কোনো
সরকারি চাকুরে।
তোমারই আমারই মতো
যারা হয়তো আজকেও বেঁচে থাকতে
পারতো,
আমারই মতো তাদের কোনো একজনের
হয়তো বিয়ের দিনটি পর্যন্ত ধার্য হয়ে গিয়েছিল,
তোমারই মতো তাদের কোনো একজন হয়তো
মায়ের সদ্যপ্রাপ্ত চিঠিখানা এসে পড়বার আশায়
টেবিলে রেখে মিছিলে যোগ দিতে গিয়েছিল।
এমন এক একটি মূর্তিমান স্বপ্নকে বুকে চেপে
জালিমের গুলিতে যারা প্রাণ দিল
সেই সব মৃতদের নামে
ফাঁসি দাবি করছি।

যারা আমার মাতৃভাষাকে নির্বাসন দিতে চেয়েছে তাদের জন্যে
আমি ফাঁসি দাবি করছি
যাদের আদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের জন্যে
ফাঁসি দাবি করছি
যারা এই মৃতদেহের উপর দিয়ে
ক্ষমতার আসনে আরোহণ করেছে
সেই বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে।
আমি তাদের বিচার দেখতে চাই।
খোলা ময়দানে সেই নির্দিষ্ট জায়গাতে
শাস্তিপ্রাপ্তদের গুলিবিদ্ধ অবস্থায়
আমার দেশের মানুষ দেখতে চায়।

পাকিস্তানের প্রথম শহীদ
এই চল্লিশটি রত্ন,
দেশের চল্লিশজন সেরা ছেলে
মা, বাবা, নতুন বৌ, আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে
এই পৃথিবীর কোলে এক একটি
সংসার গড়ে তোলা যাদের
স্বপ্ন ছিল–
যাদের স্বপ্ন ছিল আইনস্টাইনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে
আরো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল আণবিক শক্তিকে
কীভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়
তার সাধনা করার,
যাদের স্বপ্ন ছিল– রবীন্দ্রনাথের
'বাঁশিওয়ালার' চেয়েও সুন্দর
একটি কবিতা রচনা করার,
সেই সব শহীদ ভাইয়েরা আমার
যেখানে তোমরা প্রাণ দিয়েছো
সেখানে হাজার বছর পরেও
সেই মাটি থেকে তোমাদের রক্তাক্ত চিহ্ন
মুছে দিতে পারবে না সভ্যতার কোনো পদক্ষেপ।

যদিও অগণন অস্পষ্ট স্বর নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করবে
তবুও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঘন্টা ধ্বনি
প্রতিদিন তোমাদের ঐতিহাসিক মৃত্যুক্ষণ
ঘোষণা করবে।
যদিও ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতে–বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভিত্তি পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারে
তবু তোমাদের শহীদ নামের ঔজ্জ্বল্য
কিছুতেই মুছে যাবে না।
খুনি জালিমের নিপীড়নকারী কঠিন হাত
কোনোদিনও চেপে দিতে পারবে না

তোমাদের সেই লক্ষ্যদিনের আশাকে,
যেদিন আমরা লড়াই করে জিতে নেব
ন্যায়-নীতির দিন
হে আমার মৃত ভাইরা,
সেই দিন নিস্তব্ধতার মধ্য থেকে
তোমাদের কণ্ঠস্বর
স্বাধীনতার বলিষ্ঠ চিৎকারে
ভেসে আসবে
সেই দিন আমার দেশের জনতা
খুনি জালিমকে ফাঁসির কাষ্ঠে
ঝুলাবেই ঝুলাবে
তোমাদের আশা অগ্নিশিখার মতো জ্বলবে
প্রতিশোধ এবং বিজয়ের আনন্দে।

চট্টগ্রাম, সন্ধ্যা ৭টা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

হতাশার গান

পৃথিবীর বুক জুড়ে মড়কের কলরোল, যুদ্ধ, হত্যা, অশান্তির ঝড়
আমার সকল ইচ্ছা দল বেঁধে শুয়ে আছে
আকাশের বুকের উপর।
বিকেলের ক্লান্ত রোদে কখনো উজ্জ্বল হয়ে উঠে তারা
আমার চঞ্চল মন সহসা উদ্দাম হয়ে
কাজ থেকে পেতে চায় ছাড়া।
পরিত্রাণ নেই তবু কাজ শুধু কাজ
মানুষ হত্যার যন্ত্রে কোমরে শেকল বাঁধা আমি গোলন্দাজ
অকাতরে দেখে যাই রক্তপাত অনাচার, অপচয় আর
হতাশ প্রেমের শোকে মাঝে মাঝে ডাক শুনি বৈরাগ্য সাধার।

॥ দুই ॥
পেছনে ভয়াল মৃত্যু
ডাইনে বাঁয়ে পথ নেই পালিয়ে যাওয়ার
সামনে বন্ধুর পথ যদিও আঁধার
জনতার সহস্র চোখ একসাথে যদি জ্বলে উঠে
পথ পাবো এগিয়ে চলার
পৃথিবী মুখর হবে প্রেম হবে নদী
আমার সকল ইচ্ছা সমুদ্রের বুক পায় যদি।

॥ তিন ॥
সুন্দর ফুলের গুচ্ছে
ভালোবেসে হাত রেখে সহসা উদাস
একটি বিমুগ্ধ রাত্রি নক্ষত্র আকাশ
কোনোদিন অনুভব করে নাই যারা
শ্রদ্ধাভরে কোনোদিন দেখে নাই
একটি মেয়ের মুখ অথবা নদীর
নিবিড় স্বর কান পেতে যারা শোনে নাই
একটি মহৎ চিন্তা:
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
কিম্বা কোনো ভ্রষ্টনীড় রমণীর
বিশীর্ণ কঙ্কাল দেখে
মায়ের মতো ভেবে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ঢেউ
যার বুকে কোনোদিন জাগে নাই
কি আশ্চর্য পৃথিবীর সব সুখ লুটিছে তারাই।

১৯৫৩

নস্টালজিয়া

এই শহরের চকচকে গাড়ি
আকাশ ছোঁয়া দাম্ভিক বাড়ি
অর্থের দাপটে ক্লিষ্ট জনপদ ছাড়ি
আমি চাই উলঙ্গ কিশোর হয়ে
দুরন্ত দুপুরে নদীতে সাঁতার কেটে
খেয়াঘাট পার হয়ে ছুটে যেতে পায়ে হেঁটে
অনেক অনেক দূরে ছায়াঢাকা অন্ধকারে
যেখানে একটি মায়ের মুখ আঁচলে প্রদীপ ঢেকে
প্রতিদিন ডাকিছে আমারে ॥

সেখানে হৃদয়ের কোলাহল এখনো থামেনি
মায়ের হলুদবাটা স্নিগ্ধ হাতের গন্ধে
অবিরাম সুখের আশ্রয় হয়তো এখনো ভাঙেনি ॥
যদিও রয়েছে তাতে ছোট ছোট বহু দুঃখ
আছে কিছু দারিদ্র্যের নিত্যনিপীড়ন
বাইরের জগতের সীমাহীন প্রলোভন
নেই। আছে আজও অসামান্য ভালোবাসা
ভাই-বোন হাসি-কান্না
প্রিয়ার প্রতীক্ষা আছে, ভোরের প্রত্যাশা ॥
দুঃখ সেতো দুঃখ নয়,
যেখানে জননীর গগনজোড় মন
স্নেহ আর মমতায় দুঃখকে করেছে তুলে
জীবনের নিত্য প্রসাধন ॥

১৯৫৫

বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবীর দীপ্ত গর্বে
নীল সন্ধ্যায় আজও ঘুরি,
দিনে দুর্বার জাল জুয়াচুরি
রাতে অশ্লীল নারী সহবাস
উচ্চমূল্যে ক্লাবে চলে তাস
এভাবে জীবন কাটে বারো মাস
এ আছি বেশ রজত শান্তি
কখনো যদিবা ঘনায় ক্লান্তি
প্রাণপণে খুঁজি যৌনকান্তি
উলঙ্গ উরু শুধু দু'টাকায়
ফুটপাতে পাবে রোজ সন্ধ্যায়
নোটের গুচ্ছে আরো পাওয়া যায়
কাঁচুলিতে বাঁধা ভারী ভারী স্তন
মদের নেশায় ঠোঁটে চুম্বন
হীরক খণ্ডে কুমারীর মন
আহা কি সুলভ, আহা কি বেশ
এইতো আমার পাখি-ডাকা আর ছায়ায় ঢাকা
রবি ঠাকুরের সোনার দেশ ॥

১৯৫৫

পালাই পালাই

পালাই পালাই
এই শহরের গলি রাজপথ ছেড়ে চলে যাই
উড়ে চলে যাই.... দূরে চলে যাই
পালাই পালাই।
এইখানে তৃষ্ণার জল নাই জল নাই
ভিক্ষার চাল নাই– এইখানে কাজ নাই
পালাই পালাই
এই শহরের গলি রাজপথ ছেড়ে চলে যাই
পালাই পালাই
এই শহরের মনোহারী দোকানে
ফিসফিস কানাকানি– বেচাকেনা সমানে
পুতুলের চড়া দাম মানুষের দাম নাই
পালাই পালাই।

১৯৫৫

কুয়াশার বীজ

কুয়াশার বীজ বুনে চলে গেছে চাষা
আমাদের প্রপিতামহেরা প্রাণপণে ঢেলে গেছে জল
আমরা বেড়েছি তাতে শতাব্দীর অন্তিম ফসল।
আমাদের মস্তিস্কের জটিল কোটরে
অন্তহীন দুঃস্বপ্নের নিরক্ষর ব্যর্থ ব্যাকুলতা
মৃত শিশিরের কাছে প্রতিদিন খুঁজিতেছে কথা।
আমরা জীবিত তবু মৃত এই শকুনের ভোজে
কী যন্ত্রণায় তুলি প্রত্যহ বিকট নাভিশ্বাস
বিদীর্ণ কালের যাত্রা ব্যর্থ করে অগ্রজের অটল বিশ্বাস।

১৯৫৫

পরিক্রমা

প্রজ্ঞার বিচিত্র কথা বলে গেছে অনেক বিবেকী
আমাদের বহু আগে। অনেক জোনাকী
অন্ধকারে ঢেলে গেছে হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু কণা
এখন নক্ষত্র তারা জ্বলে পুড়ে হয়ে গেছে সোনা।
তাদের উত্তাপ পেতে বেদনার মেঘলোকে অনেক ঘুরেছি
অনিকেত অভিযানে যন্ত্রণার দীপ জ্বেলে গেছি
পলাশে রেখেছি হাত– সময়ের অনিবার্য বাঁকে
বিশ্বাসে খুঁজেছি আমি তর্কের অতীত বিধাতাকে।
পাগলা ঘোড়ার মতো আবেগের প্রচণ্ড প্রহারে।
কখনোবা ঢেলে গেছি অর্থলুপ্ত উচ্চকণ্ঠ অনিদ্রিত শূন্য অন্ধকারে
তবুতো বঞ্চিত আমি নির্বাসিত আলোর অন্তরালে
পরিত্যক্ত হয়ে আছি অতীতের স্মৃতির জঞ্জালে।
বহু অনুক্রম শেষে তাই আমারও বিশ্বাস:
স্বগত সন্তাপে আজ অবলুপ্ত আমাদের মুক্তির প্রয়াস ॥

১৯৫৮

জীবনের সফলতা

জীবনের সফলতা যাকে বলো।
কিছু টাকা জলের মতোন
কিছু খ্যাতি প্রতিপত্তি
একটি সুন্দর নারী বিলাস সঙ্গিনী
হয়তোবা পাওয়া যায়
জীবনের লটারিতে যদি উঠে নাম।
কিম্বা যদি জীবনের খরস্রোতে
উপল খণ্ডের মতো
ভেসে যেতে পারো
হয়তোবা একদিন পেয়ে যাবে কূল।
কিম্বা কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী উকিলের মতো
ব্রহ্মচর্য সাধনায়
ব্যয় করি জীবনের দুর্লভ যৌবন
মরুভূমি পার হয়ে
নিশিবিদ্যা শেখা যায়
শহরের নৈশ বিদ্যালয়ে।
আহা কি নির্মম সত্য
এইসব অভিজ্ঞান আমাদের ধূসর জীবনে,
জুয়ার টিকিট শুধু কাটা
কাদা ঘেঁটে জীবনের দীর্ঘপথ হাঁটা
আদিম অভ্যাস বশে
স্ত্রী সহবাস আর ইঁদুর পালন।
হে ঈশ্বর এ জীবন লুপ্ত হোক
তার চেয়ে চলো আনি:
বিশ্বব্যাপী অসুরের সাথে সংগ্রামে রত
সাম্যের শান্তির সৈনিকের জলন্ত বিশ্বাস।

১৯৫৭

দিয়ে যাই বলি

জীবিকার যুপ কাষ্ঠে
আপনারে দিয়ে যাই বলি
আর কখনো কখনো
নীল নিবিড় নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়
উত্তেজিত হয়ে ভাবি
এই কি দুর্লভ মানব জন্মের শেষ স্বপ্ন
জীবনের রক্তিম ক্ষতে
অবিরত মাছির নিয়ন্ত্রণ।

ছোট ছোট স্বার্থের বাঁধন
ক্ষিপ্রগতিতে রূপসীর পদক্ষেপের মতোন
অস্তমিত গোধূলীর রঙিন আকাশে,
দুঃস্বপ্নের ছায়া ছড়ায়।

আমার বিচিত্র সাধ, সূর্যের সাত রং
নগদ সোনার লোভে, পিতলের দামে
বুকে হেঁটে ঢুকে পড়ে
অন্ধকারের কালো খামে।
মাঝে মাঝে দন্তহীন সাপের মতো ফুঁসে উঠি
যেমন করে ক্লান্ত গণিকা
একবার আকাশের দিকে
একবার হৃদয়ের দিকে চেয়ে
বিগত দিনের মাধুর্যকে ফিরে পাবার জন্য
আগুনের মতো উদগ্রীব হয়ে ওঠে
আর নিশাচর নাগরের চটুল সম্ভাষণে
মাতালের মতো নিবিড় সুখে
ক্রুশবিদ্ধ হয়ে পড়ে প্রাণহীন বুক থেকে বুকে।

১৯৫৯

একুশ : ১৯৭০

আমি আর লিখবো না
একুশের বিষণ্ন কবিতা
তোমাদের আনন্দিত শোকের মিছিলে
জ্বালবো না যন্ত্রণার চিন্তা।
ডাকবো না স্মৃতি-সভা
গাইবো না কোনো গান নিরর্থ বিক্রমে
সৌখিন গোলাপ গুচ্ছ হাতে নিয়ে কপট সম্ভ্রমে
যাবো না যাবো না আমি
তোমাদের সাথে
শহীদ মিনারে কিম্বা গোরস্থানে
বিদীর্ণ প্রভাতে।
সাম্যের স্বদেশ ভূমি গড়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে–
যারা আজ নেমে গেছে দুরন্ত সংগ্রামে
আসাদের রক্তমাখা ছেঁড়া শার্ট বুকে চেপে
চলে গেছে দূরান্তর গ্রামে
তাহাদের সাথে আমি হাঁটিতেছি পথ
যেখানে কাস্তের মুখে
কিষাণের তীব্রতম ঘৃণা,
দেখিতেছি সেইখানে
সালামের গুলিবিদ্ধ কলজেটা খুঁজে পাই কিনা।

দুঃসময় : ১৯৭১

সেসব দিনের কথা আমার কেবলি মনে পড়ে
যখন কেউ কাউকে ভালোবাসতো না, নিজেকে ছাড়া।
অথচ ভীষণ এক আত্মীয়তায় কয়েক কোটি লোক
একটি অভিন্ন দেহে পরিণত হয়েছিল।
সেসব দিনের কথা আমার কেবলি মনে পড়ে
যখন কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারতো না,
পথের ধারে পড়ে থাকা সন্তানের লাশের দিকে চেয়ে
বৃদ্ধ পিতা অসহায় শিশুর মতো কাঁদতে গিয়ে
গুলিবিদ্ধ হয়ে সহসা মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিল।
সেসব দিনের কথা আমার কেবলি মনে পড়ে।
তখন বাজারে বিষের দাম ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল
প্রতি ঘরে ঘরে মেয়েদের মায়েদের আঁচলে কৌটায়
শুধু বিষ: দুষমনের হাতে লাঞ্ছিতা হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।
হঠাৎ একটি যুবতী মেয়ে পাড়ার এক দোকানে ছুটে এসে
কেঁদে উঠে বলেছিল: ভাই, দু'টাকার বিষ দাও
দোকানদার বিষ কি জিনিস ঠিক চিনতো না
শুধু জানতো এ এক ধরনের কোনো কিছু,
যা খেলে মানুষ বাঁচে না, শ্মশানের যন্ত্রণা শরীর থেকে
মুছে যায়,
দোকানকার ফ্যাল ফ্যাল চোখে মেয়েটির দিকে চেয়ে
একটি ধারালো কলমটাকা ছুরি এগিয়ে দিয়েছিল মেয়েটিকে
সেসব দিনের কথা আমার কেবলি মনে পড়ে।
মনে পড়ে এক দুঃসাহসী নিরস্ত্র যুবকের কথা
ঘেরাও হয়েছিল হানাদার বাহিনীর হাতে
ওরা আদেশ করেছিল:
বাড়ির ছাদ থেকে সবুজের বুক থেকে বেরিয়ে আসা লাল বৃত্ত আঁকা
স্বদেশের রক্তিম পতাকা নামিয়ে আনতে।
সে নামিয়ে এনছিল ঠিকই। যখন আদেশ হলো একে নিজের হাতে পোড়াও
সে না না বলে চিৎকার করে উঠেছিল,
আর সঙ্গে সঙ্গে জয় বাংলা বলে লুটিয়ে পড়েছিল মাটিতে।
জানি না মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নেবার পূর্ব মুহূর্তে
সে কোনো প্রিয়জনের একটি মুখ
প্রাণপণে মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করেছিল
হয়তো মায়ের, হয়তো প্রিয়ার কিম্বা স্বদেশের
আমার সেসব দিনের কথা কেবলি মনে পড়ে।
শত্রুর কবল থেকে প্রাণ বাঁচাবার দায়ে
আমরা গ্রাম সুদ্ধ লোক আশ্রয় নিয়েছিলাম পাহাড়ে জঙ্গলে
ধিক্কৃত জ্যোছনা পলাতক, অন্ধকার রাত্রি। আমরা সবাই মাটির বিছানায় শুয়ে,
এক তরুণ দম্পতি হঠাৎ পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিল
দারুণ আবেগে স্বামী যখন সোহাগ করতে চাইলো

লজ্জাবতী মেয়ে, ছি: ছি: বলে ভয়ে সংকোচে আর লজ্জায়
রাঙা হয়ে উঠেছিল
তখন নববিবাহিত স্বামীর আকুল কণ্ঠস্বর ভেসে এসেছিল
আমার কানে। শুধু একটিবার, হয়তো শেষ বার
কাল যে বেঁচে থাকবো তারতো কোনো নিশ্চয়তা নেই।

সেই তরুণ দম্পতির
আবেগ জড়ানো সেই কণ্ঠস্বর আমার এখনো মনে পড়ে।
কিছুদিন পর কর্ণফুলির স্রোতে ভেসে এসেছিল
অনেক অনেক লাশ
সেখানে এই যুবকটিকে সনাক্ত করার জন্য কেউ ছিল না
কারণ, তখন কেউ কাউকে ভালোবাসতো না, স্বদেশকে ছাড়া।
অথচ কয়েক কোটি লোক ভীষণ এক আত্মীয়তায়
একটি অভিন্ন দেহে পরিণত হয়েছিল।
তখন পাড়ায় পাড়ায় মসজিদে মুসল্লির দারুণ ভিড়
ঘরে ঘরে কোরান পাঠ
পথে-ঘাটে শত্রুর মুখোমুখি হতেই কম্পিত ঠোঁটে কলেমা পাঠ
তারপরও আমরা মুসলমান নই: বাঙালি মানেই কাফের।
আমাদের পাড়ার ইমাম সাহেবের কথা মনে পড়ে,
যতটুকু জানি জীবনে কোনোদিন নামাজ কাজা করেননি
সফেদ দাড়ি, মুসলমানী লেবাস
মসজিদকে নিরাপদ আশ্রয় মনে করে
রাতদিন সেজদায় পড়ে থাকতেন সেখানে
শত্রু তাকে ঘেরাও করলো সেখানে:
দেখামাত্রই আচ্ছালামু আলাইকুমের উত্তর পেয়েছিলেন
রাইফেলের মুখে।

সেই দুর্দিনে সাহসী, ভীরু, অসহায়, গর্বিত
যাদের সাথে আমি ছিলাম,
যারা ভালোবাসার উজ্জ্বল সুতো দিয়ে
বেদনা অশ্রু আর রক্তের মহিমায় নির্মাণ করেছে
আমার রাষ্ট্রীয় পতাকা
মুক্তির প্রেরণায় উৎসারিত সহস্র কণ্ঠের শব্দাবলী দিয়ে
যারা তৈরি করেছে আমার স্বাধীনতার সঙ্গীত
তাদের কথা, সেসব দিনের কথা আমার কেবলি মনে পড়ে।
এখন আমার মনে প্রতিশোধের কোনো আগুন নেই
তবু আমি ভুলতে পারি না– সেইসব হত্যাকারীদের
যারা নির্মম হত্যার নির্দেশ নিয়ে
অতর্কিতে পুলিশ ছাউনি আর সেনা ব্যারাকে হানা দিয়ে
আমাদের অসংখ্য ভাইদের হত্যা করেছে,
শহীদ সাবেরকে পুড়িয়ে মেরেছে,
মুনীর চৌধুরীকে খুন করেছে,
জহির রায়হানকে অপহরণ করেছে

রাজনৈতিক অঙ্গনে আবার তাদের সশব্দ পদচারণায় আমি উদ্বিগ্ন।
যারা আমার বুকের ব্যানার থেকে মুছে দিতে চায়
অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধার অমর কাহিনী
যারা আমার হৃদয়ের তলদেশ থেকে মুছে দিতে চায়
অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধার বীরত্বের কাহিনী
যারা আমার হৃদয়ের তলদেশ থেকে
উপড়ে ফেলতে চায়– অসংখ্য শহীদের স্মৃতির মিনার,
সেইসব হত্যাকারীদের হাতে হাত মিলিয়ে
আমি বিস্মৃত হতে চাই সেইসব দিনের কথা,
যেসব কথা আর ঘটনা আমার চিরকালের প্রেরণার উৎস
আমার ভবিষ্যৎ বংশধরদের আত্মমর্যাদার স্মারক।
আমি চাই না রক্তমাখা হাতগুলো
শকুনের থাবা হয়ে আমার রাষ্ট্রীয় পতাকা
আর জাতীয় সঙ্গীতকে স্পর্শ করুক।
আমার বেদনা, অশ্রু, রক্ত আর আশায় মণ্ডিত
ইতিহাসকে যারা বিকৃত করে,
আমার হাজার বছরের ঐতিহ্যের মহিমাকে
যারা বিদ্রূপ করে
যারা আমার সন্তানের হৃদয় থেকে মুছে দিতে চায়
বরকত সালামের অমর স্মৃতি
আমি চাই না সংসদে বসে
তারা আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করুক
তাদের বুটের আওয়াজে আবার শংকিত হয়ে উঠুক
আবহমান বাংলার স্বাধীন মানুষ।

১৯৭১

অঙ্গীকার

কথা সাজাবার দিন নয় ভাই আজকে
বর্গিতে ভরে গেছে দেশটা
কাঁধে তুলে নাও ঐক্যের লাল ঝাণ্ডা
সার্থক হোক কোটি জনতার চেষ্টা

মৃত্যুর ভয়ে ভীরু ক্রন্দন আর না
প্রাণ দিয়ে জীবনের দাম নে
যারা কাপুরুষ পেছনেই তারা থাক না
আমরা দাঁড়াব বুলেটের ঠিক সামনে ॥

শান্তির নামে মুক্তি বেচি না আমরা
ভিয়েতনামের পথ ধরে খুঁজি মুক্তি
মৈত্রীর নামে যারা তুলে নেয় আমাদের কালো চামড়া
তাদের সঙ্গে নেই আমাদের চুক্তি।

স্নায়ু তানপুরা পেশীতে পেশীতে কী তন্ময়
আমাদের পথ অজেয় সমাজবাদ
নির্যাতিতের মুক্তির পথ রক্তময়
প্রতি মুহূর্তে রক্তের লাল আস্বাদ।

২৩ মার্চ ১৯৭১

একুশ : ১৯৭২

একুশের শহীদেরা চলে গেছে রক্তবীজ বুনে
বিশটি বছর ধরে আমরা ঢেলেছি তাতে যন্ত্রণার জল
এখন ভরেছে মাঠ আদিগন্ত চারিদিকে সোনার ফসল।

আমার ক্ষেতের সোনা কলজে ছেঁড়া রক্ত দিয়ে বোনা
আমার মাঠের ধান বহু লক্ষ শহীদের রক্ত পেয়ে সোনা
আমার দুর্লভ মুক্তি মা-বোনের অশ্রু দিয়ে কেনা
আমার এ দীর্ঘ পথ বুলেটের অগ্নি দিয়ে চেনা ॥

আমার সোনার দেশে আবার যদি বাড়াও তুমি হাত
স্বার্থের সুড়ঙ্গ দিয়ে করো যদি গোপনে আঘাত
তোমার বিষাক্ত শ্বাসে অভিশপ্ত করো যদি আমার ভাণ্ডার।
জননীর অঙ্গভোগী লুব্ধ যাযাবর এইবার পাবে না নিস্তার ॥

আমি এক নতুন প্রতিজ্ঞাপত্রে করেছি স্বাক্ষর
আমার শিরায় জাগে দুর্বিনীত শত লক্ষ ক্ষ্যাপা অজগর;
অতন্দ্র প্রহরী আমি চারিদিকে বেদনার স্তম্ভিত পাহাড়
এখানে সৈনিক আজ সাতকোটি; প্রতি হাতে দধিচীর হাড়
নবতর কুরুক্ষেত্র শিয়রে আমার ॥

সীমান্তে উদ্যত আজও শিলীভূত চেঙ্গিসের শাণিত নখর
পেছনে স্মৃতির প্রান্তে জ্বলিতেছে পলাশীর নির্মম প্রান্তর ॥

১৯৭১

জারজেরা সব শোন

যদিও ছিন্নভিন্ন হৃদপিণ্ড বিকলাঙ্গ রুধিরাক্ত জননীর বেশ
তবু যে নামেই ডাকো, এটা দুর্জয় বাংলাদেশ।
তোমরা যারা দৈব-সন্তান অথবা জারজ
বার বার বর্গী ডেকে এনেছো এই দেশে
কায়েমী স্বার্থের সিংহদ্বার প্রহরায় রত
জননীর অঙ্গভোগী ভগ্নি ব্যভিচারী
লোমখসা বন্য কুকুরের মতো
শঙ্কিত মাতৃবক্ষ হতে সন্তান নিয়েছো কাড়ি
শিশু হন্তা লুব্ধ যাযাবর
বসে আছো অসংখ্য শহীদের লাশের উপর
ক্ষমতার দীপ জ্বালি
আমরা সবাই জানি, তোমাদের ধমনীতে বাজে কাদের করতালি?

জারজেরা সব শোন: একথা নিশ্চিত জেনো
অসম্ভব ইতিহাসের সম্মুখ-গতি পেছনে ফেরানো ॥

তোমরা জানো না, আমার ক্ষেতের সোনা
কলজে ছেঁড়া রক্ত দিয়ে বোনা
আমার মাঠের ধান বহু লক্ষ শহীদের
রক্ত পেয়ে সোনা
আমার সবুজ ঘেরা রক্তিম পতাকা
অসংখ্য মা-বোনের অশ্রু দিয়ে বোনা
আমার মুক্তির পথ বুলেটের অগ্নি দিয়ে চেনা।

আমার স্বাধীনতার পতাকায়
আবার যদি বাড়াও তুমি হাত
আমার আজন্ম লালিত গানে
করো যদি গোপনে আঘাত
লুব্ধ যাযাবর এইবার
পাবে না নিস্তার।
অতন্দ্রপ্রহরী আমি
যদিও চারিদিকে ষড়যন্ত্র, দুই চোখে বেদনার স্তম্ভিত পাহাড়
তবুও মুক্তির পাহারাদার আট কোটি সৈনিক
প্রতিহাতে দধিচীর হাড় ॥

একটি নদীর নাম

একটি নদীর নাম অশ্রুমতী।
আর একটি নদীর নাম রক্তবন্যা।
যদি দেখতে চাও চলে এসো সেই দেশে
যেখানে সীতাকুণ্ডের গোড়ায় জ্বলছে
বাড়বকুণ্ডের দাবানল।
যদি দেখতে চাও একটি সমুন্নত পাহাড়
যার অভ্যন্তরে স্তূপীকৃত মানুষের
বিশীর্ণ কঙ্কাল।
চলে এসো সেই দেশে
যেখানে সীতাকুণ্ডের গোড়ায় জ্বলছে
বাড়বকুণ্ডের দাবানল।
যদি দেখতে চাও অশ্রুমতীর উৎস
খুঁজতে হবে না তোমার কোনো ভূতাত্ত্বিক,
তীরে দাঁড়িয়ে শুধু উচ্চারণ করবে একটি অগ্নিমন্ত্র;
জয় বাংলা– জয়তু শেখ মুজিব
সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠবে সাড়ে সাত কোটির
একটি উত্তেজিত কণ্ঠস্বর
আর অস্থির হয়ে তুমি উপড়ে ফেলতে চাইবে
পৃথিবীর কোটি কোটি যন্ত্রণার শ্মশান।
তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে
আর একটি নদী, রক্তবন্যা
শুনতে চেয়ো না তার কাছে
অসংলগ্ন কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা।
এখানে এসে তোমার অপেক্ষা করতে হবে
একটি নতুন দৃষ্টি চোখে আনার জন্য।
স্পেনের ঘটনা যদি তোমার না জানা থাকে
যদি না পড়ে থাকো প্রাচীন রোমের স্পার্টাকাসের কাহিনী
প্যারী কমিউনের প্রেরণায় যদি উদ্দীপিত না হও
কিম্বা ফরাসি বিপ্লবের তিনটি মন্ত্র পার হয়ে
যদি তুমি প্রবেশ না কর সেন্ট পিটার্সবুর্গের সশস্ত্র সংগ্রামে
বুঝতে পারবে না– এই নদীর আত্মকথা।
একে বোঝার জন্য কথা বলতে হবে তোমার সূর্যসেনের সঙ্গে
বিহারের মুসলমান আর নোয়াখালীর হিন্দুরা যেখানে প্রাণ দিয়েছে
সেখানে তোমার যেতে হবে।
যেতে হবে তোমার রাজঘাটে
মহাত্মার চিতাভস্ম যেখানে আজও কথা বলে।

গভীর রাত্রে রমনার কৃষ্ণচূড়ার তলায়
তোমার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

দেখতে পাবে কয়েকটি ছায়া মূর্তি তোমার দিকে ছুটে আসছে
ওরা বলবে: আমি বরকত আমি সালাম আমি জব্বার।

ভয় পেয়ো না তাদের দেখে
তাদের কারো মাথা নেই কারো মুখ বিকৃত বিধ্বস্ত

ওরা তোমার হাত ধরে নিয়ে যাবে রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে
সেখানে যদি ইতস্তত: কয়েকটি লাশ চোখে পড়ে
ভয় পেয়ো না। ইলা মিত্রের সঙ্গে যদি কথা বলতে চাও
চলে যেও কলকাতায়, তিনি এখনও জীবিত।

শনাক্ত করতে পারবে এই লাশগুলো।
তারপর অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে যদি প্রবেশ করতে পারো
গারো পাহাড়ের অভ্যন্তরে
দেখতে পাবে একদল হাজং বিষাক্ত তীর ধনুক নিয়ে
ছুটে আসছে তোমার দিকে।

ভয় পেয়ো না তাদের দেখে।
তাদের নেতা মণি সিংহ
তারা ধরে নিয়ে যাবে তোমাকে
কমরেড মণি সিংহের কাছে
তিনি বলতে পারবেন, এ দেশের সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনী।
নীল হলুদ লাল সংগ্রামের কাহিনী।

ডিসেম্বর ১৯৭১

স্বাধীনতা : ১৯৮৪

স্বাধীনতা সেকি মৃগ-তৃষ্ণিকা
শেখ মুজিবের বাঘা গর্জন
স্বাধীনতা সেকি সবুজের বুকে
গোলাকার লাল পাতাকা উত্তোলন ॥

স্বাধীনতা সেকি ডলি চৌধুরীর ব্যাংকের চেকে
বাংলা স্বাক্ষর, বিদেশী গোয়েন্দাগিরি
স্বাধীনতা সেকি সুযোগ শিকারী
বুদ্ধিজীবীর উপরে ওঠার
কার্পেট বিছানো সিঁড়ি ॥

স্বাধীনতা সেকি শান্ত্রী-আমলার যৌথ চুক্তি
জন প্রতিনিধিহীন বেআইনী শাসন
স্বাধীনতা সেকি একাত্তরের খুনিদের কাছে
ক্রমাগত আত্মসমর্পণ ॥

স্বাধীনতা সেকি নিখোঁজ বালক
শিশু রাসের করুণ মৃত্যু
শিশুহত্যা, নারীহত্যা, মৃত্যুর উদ্বোধন ॥

স্বাধীনতা সেকি পশুদের ভয়ে
জীবন থেকে ধীরে ধীরে পলায়ন
স্বাধীনতা সেকি গোলাপ গুচ্ছে অবিরত কীটের দংশন ॥

স্বাধীনতা সেকি বঙ্গভবনের অনুষ্ঠানে
মাঝে মধ্যে হুইল চেয়ারে মুক্তিযোদ্ধার
করুণ উপস্থিতি

স্বাধীনতা সেকি ঘরে ফিরে সেই
একই বৃত্তে ফিরে আসা
ইয়াহিয়া খানের পোস্টারে আঁকা
পশুর প্রতিকৃতি ॥
স্বাধীনতা সেকি কতিপয় লোকের
পকেটের লজেন্স যখন ইচ্ছা
দয়া করে বিলাবেন
স্বাধীনতা সেকি কোনো দুর্জনের
লুটের পসরা যখন ইচ্ছা
আবার ছিনিয়ে নেবেন ॥

ভয় লাগানো গোঁফ

সূর্যসেনের ভয় লাগানো গোঁফ ছিল না
আর টেগরার ছিল না ভয়াবহ
শশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল।

সাধারণ সাদামাটা চেহারা নিয়ে
তারা অস্ত্রাগার দখল করেছিলেন
লাল সূর্যের দাবি মিটিয়েছিলেন রক্ত দিয়ে।

চে'গুয়েভারার বীভৎস গোঁফ আর দাঁড়ি ছিল
তার সংগ্রামের হাতিয়ার।

তাই কোনোদিন তারা হতে চাননি
পরিত্যক্ত সম্পত্তির বেনামী মালিক
অথবা পুনর্বাসন সমিতির বাচাল সভাপতি।

জসিমউদ্‌দীনের মৃত্যুতে

একখণ্ড গ্রাম এনে লাগিয়েছিলেন তার লনে
সেখানে বিহঙ্গমা পাখি আসবে বলে
অনেক ঝোপঝাড় পুঁই শাক তুলেছিলেন সযত্নে
স্বর্গের পথ সহজ জেনেও নিসর্গের শোভা
যাকে মুগ্ধ করেছিল সে প্রকৃতি-মাতাল কবির তিরোধানে
কয়েকটি ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম ফুল-বাড়ি।
দেখলাম বিহঙ্গমা আসেনি তার সাজানো বাগানে
আর কোনোদিন আসবে না জেনে
তিনি চলে গেলেন দাদীর কবরের পাশে
তার চিরচেনা গ্রাম ভালোবেসে ॥

ওরা দুইজন

(হাসান হাফিজুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশে)

হাসান আর শামসুর রাহমান
দুই বন্ধু অভিন্ন পরান
উভয়ে গলাগলি করে হাঁটে
কখনো মধুর ক্যান্টিনে
কখনো বাংলাবাজারে বইয়ের দোকানে
দু'জনের সমান উৎসাহ দুরূহ কবিতা পাঠে ॥

মাঝে মাঝে দু'জনকে দেখা যায়
দুর্বিনীত ছাত্রদের নিষিদ্ধ সভায়
কখনো ভূতলবাসী নেতার বক্তৃতা
দু'জনেই মুগ্ধ হয়ে শুনে
অটল বিশ্বাসে প্রতীক্ষায় অঙ্গীকারে
দুই বন্ধু কবিতা লেখে ॥

সুভাষ সুকান্ত পার হয়ে বুদ্ধদেবে এসে
জীবনানন্দ ছুঁয়ে ছুঁয়ে
দু'জন দু'দিকে চলে গেল
দু'টি স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর নিয়ে
একজনের প্রবল আগ্রহ বিশুদ্ধ উচ্চারণে
অন্যজন কিছুটা প্রগলভ শব্দে উপমায়
যা কিছু বলার
সরাসরি বলতে চায় আটপৌরে ভাষায়,
একজন বিধ্বস্ত নিলীমা থেকে তুলে নিয়ে
অসংখ্য হৃদয়ে ছড়ানো মুঠো মুঠো তারা
অন্যজন চিরতরে চলে গেল।
মাটিতে রোপণ করে বিদ্রোহের চারা ॥

১৯৮৪

এ. বি. সি.

কবিতা নন্দিত প্রাণ আবদুল বারীক চৌধুরী
এ.বি.সি. নামে খ্যাত আমাদের পরম সুহৃদ
অনর্গল বলে যেত বৈঠকে আসরে সারারাত ধরি
সুধীন দত্ত বিষ্ণু দে জীবনানন্দ শামসুর রাহমান
বিনাক্লেশে বলে যেত কবিতা নন্দিত প্রাণ
বাংলার প্রায় সকল কবির কবিতাগুচ্ছ
আমাদের সকলের প্রিয় এ. বি. সি. নামে খ্যাত
সদা প্রফুল্ল চিত্ত বন্ধুত্বের আবাল্য কাঙাল।
দীর্ঘদিন রোগে ক্লান্ত অথচ কোনোদিন হয়নি মলিন
সর্বক্ষণ মুখে হাসি লেগেছিল চরম ব্যাধিতেও
সদা প্রফুল্ল চিত্ত আমাদের পরম সুহৃদ।
হেসে হেসে চলে গেল।
কোনো দুঃখের ভারে ক্লান্ত হলো না কোনোদিন।

ছড়া

ইচ্ছা যদি হতো প্রেমপত্র
লিখিতাম রোজ রাত্রে।
প্রেম যদি হতো নারী-হৃদয়
রাখিতাম সুধা পাত্রে।

অহিংসায় যদি স্বরাজ আসতো
রাইফেল দিতাম পুড়িয়ে
বুদ্ধের বাণী শেফালীর মতো
আঁচলে নিতাম কুড়িয়ে।

কথায় যদি ফসল ফলতো
স্বদেশ হতো স্বনির্ভর
যারাই আসুক আসল নকল
দেশটা চালায় তিন অক্ষর ॥

১৯৫৬

ছড়া

রাজারে রাজা এ কেমন সাজা
উঠতে গেলে বসতে বলিস
বসতে গেলে ছুটতে।
হরিণ হয়ে ছুটি যদি
বলিস তখন উড়তে।
হাতে পায়ে শিকল দিলি
কেমন করে উড়বো।
বুকে জ্বালা মুখে তালা
কেমনে মুখ খুলবো।

মা বলেছে মরার কালে
ফসল ভালোবাসতে
ধান করেছি সোনার বিলে
তোমার হাতে কাস্তে।

লালকে বলিস কালো রাজা
নীলকে বলিস লাল।
মিষ্টিকে তুই তেতো বলিস
টক্‌কে কেন ঝাল,
প্রশ্ন যদি সুধাই রাজা
তেড়ে আসিস মারতে
দুঃখ পেয়ে কাঁদি যদি
বলিস তখন হাসতে।

ভাই মেরেছিস– বোন মেরেছিস
কেমন করে হাসবো
এবার যদি হাসতে বলিস
বজ্র হয়ে আসবো।

১৯৬০